প্রতিধ্বনি ফেরে

প্রতিধ্বনি ফেরে

প্রেমেন্দ্র মিত্র

চক্রবর্তী চ্যাটার্জী অ্যাণ্ড কোং লিঃ
১৫, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা-৭০০০৭৩

প্রকাশক :
এম. ভট্টাচার্য, বি. কম্.
১৫, কলেজ স্কোয়ার
কলিকাতা-৭০০০৭৩

প্রথম প্রকাশ—এপ্রিল, ১৯৫৪

মুদ্রক :
মলয় ঘোষ
রঞ্জনা প্রিন্টিং ওয়ার্কস
পি-৪৬, নজরুল ইসলাম অ্যাভিন্যু
কলিকাতা-৭০০০৫৪

শ্রীদিলীপকুমার রায়
পরম শ্রদ্ধাস্পদেষু

এই উপন্যাসের
সমস্ত চরিত্রই
কাল্পনিক

এক

প্রথমে মনে হয় সাদা জাজিমের ওপর যেন কালো তিল ছড়ানো। তিলগুলোর নড়াচড়া দেখে বোঝা যায় তিল নয়, পোকা। অসংখ্য পোকায় সাদা চাদর ছেয়ে গেছে।

প্রথমে তিলের মত পোকারই আধিপত্য ছিল। সে আধিপত্য বেশীক্ষণ থাকে না। আরো নানা জাতের পোকা ক্রমশ দেখা দেয়। ঘুর ঘুরে, এককামড়ি, ফড়িং, ঝিঁঝি, আরো কত রকম যে পোকা তাদের নামও জানা নেই। তার ভেতর ডেঁও পিঁপড়েরাও এসে হানা দিচ্ছে এখন।

এ যেন পোকাদেরই সভা।

মানুষজনের বিরলতায় অন্তত তাই মনে হয়।

সভা আরম্ভ হওয়ার কথা ছিল সন্ধ্যে সাতটায়। এখন প্রায় সাড়ে সাতটা বাজে।

জন বারো লোক মাত্র এদিকে ওদিকে অসংলগ্নভাবে ছড়িয়ে বসে আছে। যেন এলোমেলো খাপছাড়া ক'টা অক্ষর, কোন অর্থের সংগতিতে যারা একত্র নয়।

ওধারে একটি সাজানো চৌকির ওপর বাঁধানো ফটোটা রাখা, তার ওপর কয়েক গাছা মোটা গোড়ের মালা। তার সামনে দুটি ফুল-দানিতে রজনীগন্ধা। বেশ পরিচ্ছন্ন ব্যবস্থা। কোন বহ্বাড়ম্বর নেই।

ভিড় বা হৈচৈ যে হবে না জানাই ছিল। কিন্তু তাই বলে এ সভা এমন ফাঁকা হবে এটা ভাবা যায় না।

বর্ষার দিন। বিকেল থেকে সমানে খানিকক্ষণ আগে পর্যন্ত বৃষ্টি পড়েছে বটে, কিন্তু তাতেও এই বারো তেরোটি লোক ছাড়া আর কারুর আসবার উৎসাহ হয়নি এটা বিশ্বাস করা শক্ত।

বছর দশেক আগেকার একটা ছবি আপনা থেকেই মনে ভেসে ওঠে। এমনি একটি হলঘরেরই সভা। এই রকমই মেঝের ওপর ঢালাও শতরঞ্জি আর চাদর বিছানো। কিন্তু পোষাকের নয়, মানুষের ভীড়েই সেখানে তিল ধারণের জায়গা ছিল না। বাইরের দরজাগুলোতে পর্যন্ত ঠেলাঠেলি ঠাসাঠাসি।

যার নামে সেদিনকার ওই ঠেলাঠেলি তারই মালা-ঝোলানো ছবিটা সভার শিয়রের দিকে আজ বসানো।

ছবিটাও কয়েক বছর আগের তোলা। ভালো হাতের তোলাই হবে। মুখটা যেন জীবন্ত। চোখের দৃষ্টির সেই ঈষৎ বিষণ্ন কৌতুকের আভাসটুকু পর্যন্ত ধরা পড়েছে।

সে কৌতুক যেন এই সভার প্রহসনের দিকে চেয়েই আজ ফুটে উঠেছে ভাবতে ইচ্ছে করে।

সাতটা বেজে পঁয়ত্রিশ মিনিট হল।

সেই বারোজন,—না আরো দুজন এই এলেন।

বৃষ্টি আবার বাইরে পড়তে শুরু করেছে নিশ্চয়। নবাগত দুজনেই ভেজা ছাতা মুড়ে কোথায় রাখবেন ঠিক করতেই যেন দিশাহারা। সভায় নয়, যেন কোন স্টেশনের ওয়েটিং রুমে তাঁরা হঠাৎ ঢুকে পড়েছেন।

পোকার উপদ্রব আরো বাড়ছে।

ছাড়া ছাড়া ভাবে সামনের ফটোর দিকে মুখ করে যাঁরা বসেছেন তাঁরা সবাই একটু উসখুস করছেন। পোকার অত্যাচারেই বোধহয়।

সভার উদ্যোক্তাদের দুজন ওদিকে কি পরামর্শ করছেন। হাতঘড়ির দিকে ঘন ঘন তাকানো দেখে মনে হয় আর দেরী করা তাঁরা উচিত মনে করছেন না।

আরো একজন বাইরে থেকে এলেন। বয়স্কা মহিলা। হ্যাঁ, পরিচিত-ই। ছাতা নেই সঙ্গে। বেশ ভিজেই গেছেন।

মাথার ভিজে আঁচলটা খুলে কাছে-ই এসে বসলেন। এ দিকে আরো তু'একজন মেয়ে বসেছেন বলে বোধহয়।

খানিক এদিক ওদিক তাকিয়ে হঠাৎ চোখ ফেরালেন অবাক হয়ে—কে জয়া না!

জয়া শুধু মাথাটা নাড়ল। উত্তর দিলে না।

কিন্তু তাতে প্রশ্ন থামল না।—কতক্ষণ এসেছ?

এই খানিকক্ষণ।—জয়া ইচ্ছে করেই মুখটা অন্য দিকে ফিরিয়ে রেখে উত্তব দিলে।

ভদ্রমহিলা কি বুঝলেন বলা যায় না। কিন্তু আর কিছু প্রশ্ন করলেন না।

জয়া নিশ্চিন্ত হল। ভদ্রমহিলা তাকে অভদ্র ভাবলেন নিশ্চয়। তা ভাবুন। কারুর সঙ্গে আলাপ করবার প্রবৃত্তি তার এখন নেই। ভদ্রমহিলার নামটা মনে পড়ছে না। কিন্তু কোথায় কি সূত্রে পরিচয় সবই মনে আছে। পরিচয় সেই নির্বাচনের হট্টগোলের সময়। সে স্মৃতিটা খুব মধুময় নয়।

ভদ্রমহিলার তাকে চিনতে পারা কিন্তু আশ্চর্য। সবাই তো বলে সে নাকি এই ক'বছরে এমন বদলে গেছে যে চেনা-ই যায় না। এখানে আরো তু'চারটে পরিচিত মুখ তার চোখে পড়েছে। তাঁরা কিন্তু কেউ তাকে চিনেছেন বলে মনে হয় না। অন্ততঃ তাঁদের ব্যবহারে তা প্রকাশ পায়নি।

এই না চেনাতেই অবশ্য সে খুশী। সে অপরিচিতের মতই এখানে উপস্থিত থাকতে চায়। আসবার আগে মনে তার যেটুকু দ্বিধা ছিল তা পাছে কেউ তাকে চেনে এই ভয়েই।

এসেছে সে অবশ্য অনেকক্ষণ। সাতটার অনেক আগেই।

হলঘর তখন প্রায় ফাঁকা। উদ্যোক্তাদের একজন তখন ফুলদানিতে রজনীগন্ধা সাজাচ্ছেন।

জয়া তাঁকে চিনেছিল। কিন্তু বিপিনবাবু যে চেনেননি তা তাঁর

কথাতেই বোঝা গেছল। একটু কুণ্ঠিতভাবে বলেছিলেন,—বসুন। যা বৃষ্টি, আজ সভা ঠিক সময়ে আরম্ভ করতে পারব বলে মনে হচ্ছে না।

জয়া কোন উত্তর না দিয়ে একেবারে পিছনের দিকে গিয়ে একা একা বসেছিল। বসে বসে পোকাদের ভীড় বাড়াই দেখেছিল।

একটি দুটি করে লোক আসার ধরনে সভার পরিণাম বুঝে একবার ভেবেছিল উঠেই চলে যাবে। কিন্তু যেতে পাবেনি খানিকটা আলস্যে, খানিকটা শোভনতার খাতিরে কিংবা করুণাতেই বলা যেতে পারে।

কেন যে এল তাই নিজেকে প্রশ্ন করেছে অবশ্য অনেকভাবে।

সত্যি তার এ সভায় আসার কি প্রয়োজন ছিল ?

যে মানুষটার জন্যে এই সভা সে যেমন পৃথিবী থেকে মুছে গেছে, সেও তো তেমনি অনেক আগে-ই মুছে গেছে সে মানুষটার জীবন থেকে।

সেই মুছে যাওয়ার কোন গোপন ক্ষোভই কি তাকে টেনে এনেছে এখানে !

না, জয়ার মন তা স্বীকার করে না কিছুতেই।

থেকে থেকে দৃষ্টিটা ওই সামনের ছবিটার ওপরই গিয়ে পড়েছে অবশ্য। কিন্তু সেই চেয়ে দেখার মধ্যে কোন বেদনা নেই, জ্বালাও নয়।

যা আছে—না, যা আছে তা অবশ্য জয়া কিছুতেই স্পষ্ট করে তুলতে পারে না নিজের কাছে। স্পষ্ট করে তুলতে চায়ও না বোধহয়।

নিরুপায় হয়ে বিপিনবাবু সভার কাজ আরম্ভ করে দিয়েছেন।

জয়া হাতঘড়িটার দিকে তাকাল। পৌনে আটটা।

বিপিনবাবু যা বলছেন, সব ঠিক শুনতে পাচ্ছে না মনোযোগের অভাবেই বোধহয়। ছাড়া ছাড়া ভাবে কয়েকটা কথা কানে যাচ্ছে।

গোটা কতক মামুলি বিশেষণ, গতানুগতিক উচ্ছ্বাস, আর ফিরে ফিরে একটা নাম,—উমাপতি, উমাপতি—

বাইশ তেইশ চব্বিশ পঁচিশ—নিজের অজান্তেই বুঝি জয়া গুণতে শুরু করেছিল।

মাত্র পঁচিশজন শ্রোতার কানে আজ এই প্রায়-ফাঁকা হলঘরে ওই নাম ধ্বনিত হচ্ছে দেখে হাসি পায় না, দুঃখ হয়!

উমাপতি ঘোষাল!

একদিন ওই নাম লক্ষ লক্ষ কণ্ঠে ধ্বনিত হয়ে দেশ থেকে দেশান্তরে ছড়িয়ে পড়বে বলে তার নিজেরও কি মনে হয়নি?

সে কবে? মন সেই অতীতে চলে যাবার পথেই বাধা পেল।

বিপিনবাবুর পর আরেকজন বক্তৃতা দিতে দাঁড়িয়েছেন। জয়া এঁকেও চেনে।

একদিন ভালো করে-ই চিনত।

নিশীথবাবু তখন এমন বৃদ্ধ হয়ে ভেঙে পড়েননি। মাথায় সাদা চুল, কিন্তু দেহে যৌবনের শক্তি ও উৎসাহ।

নিশীথবাবুর মারফতই উমাপতির সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল।

সে কোন্ উমাপতি?

নিশীথবাবু মামুলি বক্তৃতা দিচ্ছেন না। তাঁর কণ্ঠে আবেগ, কিন্তু ভাষায় গভীর আন্তরিকতা।

কি বলছেন তিনি গাঢ় কণ্ঠে?—উমাপতি ঘোষালের স্মৃতিসভায় আমার দুটো কথা বলবার জন্যে দাঁড়াতে হয়েছে এটা ভাগ্যের নিষ্ঠুর বিদ্রূপ, কিন্তু মুষ্টিমেয় ক'টি অনুরাগী আজ এই দীন সভায় উমাপতির স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা প্রীতি জানাতে যে সমবেত হয়েছে এটা ভাগ্যের পরিহাস আমি মনে করি না; এ পরিহাস উমাপতির নিজেরই, পরিহাস আমাদের সঙ্গে, এই যুগের সঙ্গে, মূঢ় উদাসীন জনসমাজের সঙ্গে। করুণ হতাশ পরিহাস। এক আশ্চর্য মিছিলের মশাল সে

জ্বালাতে চেয়েছিল, তা পারেনি ব'লে নিজের শিখায় নিজেকেই সে ভস্মীভূত করে গেছে। কোন চিহ্ন যেন তার কোথাও না থাকে।

নিশীথবাবু তাঁর দিক থেকে সত্য ভাষণই হয়ত দিচ্ছেন, তবু জয়ার চীৎকার করে প্রতিবাদ করতে ইচ্ছা করে,—না, না কিছুই তোমরা জান না। কেউ তোমরা চেননি উমাপতিকে!

অসীম কলম থামাল।

নিশীথবাবু বক্তৃতা দিয়ে চলেছেন। তা দিন। যতটুকু লিখেছে তাই যথেষ্ট। এইটেই সাজিয়ে গুছিয়ে আধ কলম করে দেওয়া যাবে অনায়াসে।

এখন উঠে পড়তে পারলে হয়। অফিসে গিয়ে কপিটা দিতে পারলেই আজকের মত ছুটি। সভার দু'চারজন গণ্যমান্যের নাম দিতে পারলে ভালো হত। কিন্তু এক নিশীথবাবু ছাড়া আর কাউকে তো দেখছে

বিপিন ঘোষের নামটা দেওয়া যায়। কিন্তু দেবার দরকার-ই বা কি?

এদিক ওদিক চাইতে আর একটা মুখ চোখে পড়ল। নীরজা দেবী না? নীরজা দেবী এই সভায় এসেছেন! উমাপতি ঘোষালের স্মৃতিসভায়!

চার বছরও তো এখনও হয়নি।

উমাপতি ঘোষালের প্রতিষ্ঠার মঞ্চ ধূলিসাৎ করতে শেষ চরম আঘাত যিনি দিয়েছিলেন এই কি সেই নীরজা দেবী?

অসীমকে ভালো করে আর একবার লক্ষ্য করতে হয়।

হ্যাঁ, সেই নীরজা দেবীই। চেহারা একটু বদলেছে, কিন্তু তার চেয়ে একেবারে পাল্টে গিয়েছে বেশ-ভূষা-প্রসাধন। তাই প্রথমটা চিনতে কষ্ট হয়।

ঠিক হয়েছে। কপির ছকটা অসীম মনে মনে পাল্টে ফেললে।

না, মামুলি কিছু নয়। সভার বিবরণটা অন্যভাবে বেশ সাজানো যাবে। অন্য সুর দিয়ে।

এই শ্রোতাবিরল প্রশস্ত হলঘর। এই বৃষ্টির বিষণ্ণ রাত। এই অখ্যাত নগণ্য মুষ্টিমেয় সভাসদদের মধ্যে নিশীথ পালের মত অশীতিপর আদর্শোন্মাদ এক বৃদ্ধ আর নীরজা দেবীর মত···

নীরজা দেবীর মত কি.?

নীরজা দেবীর মত উমাপতির জীবনের পরম শনি? না ঠিক হল না। উদ্ভাসিত খ্যাতির প্রাঙ্গণ থেকে উমাপতি ঘোষালের করুণ আত্ম-নির্বাসনের যিনি মূল,·সেই নীরজা দেবী!

থাক এখন। এই ধরনের একটা কিছু গুছিয়ে লেখা যাবে পরে।

জামার আস্তিনের মধ্যে একটা পোকা ঢোকাতে অসীমকে খানিক বিব্রত হতে হল।

পোকাটা বার করে নেবার পর মনে হল, এই পোকাগুলোর কথাও থাকবে।

না, কপিটা মন্দ হবে না। নিউজ এডিটর রামবাবু এই সভার ভারটা দেওয়ার সময় সত্যিই মনটা খুঁত খুঁত করেছিল।

এই তার উঠতি মরসুম। দু'চারটে লেখা ইতিমধ্যেই কর্তাদের নজরে পড়েছে। এই সময় এ ধরনের একটা বরাত পেয়ে তাই খারাপ লেগেছিল একটু।

উমাপতি ঘোষাল তো হতে-পারতোদের দলের একটা ভুলে-যাওয়া নাম। যবনিকা-পড়া একটা নাটক। নিবে-যাওয়া আগুনের ছাইগাদা।

তাঁর শোকসভা সম্বন্ধে কি-ই বা লেখা যাবে মনে হয়েছিল। সভায় এসে আরো হতাশ হয়েছিল সভার চেহারা দেখে। প্রথমে হতাশ তারপর উদাসীন। যাকগে যাক। যেমন তেমন কিছু লিখে দিলেই চলবে। সকাল সকাল ছুটি পাওয়াটাই বড় হয়ে উঠেছিল তখন।

এখন মনে হচ্ছে এই সামান্য মশলা থেকেই নতুন ধরনের কিছু বানিয়ে তোলা যাবে। আধ কলমই বা কেন? পুরো এক কলম হলেও রামবাবু আপত্তি করবেন না নিশ্চয়। লেখাটা শুধু যদি উতরোয়।

নীরজা দেবীর সঙ্গে অবশ্য একটু দেখা করে নিতে হবে! তাঁর কথার ঠিক মত ফোড়ন দিতে পারলে লেখাটা খুলবে-ই।

এখন সভাটা যে শেষ হলে হয়।

নিশীথবাবু থেমেছেন। তাঁর জায়গায় অচেনা কে একজন উঠেছে বলতে। অচেনা ও অবান্তর।

ওকি! নীরজা দেবী যে উঠে চলে যাচ্ছেন! সভার মাঝখানেই চলে যাচ্ছেন।

অসীম আর দ্বিধা করলে না। উঠে পড়ে তাঁর পিছু নিলে।

ওপরের হলঘরে সভা। নীরজা দেবীকে সেই সিঁড়ির তলায় গাড়ি-বারান্দায় গিয়ে ধরতে পারলো। নীরজা দেবী তখন তাঁর গাড়িতে উঠতে যাচ্ছেন।

শুনছেন!

নীরজা দেবী একটু ভ্রুকুটি করে ফিরে তাকালেন।

এ ভ্রুকুটিতে দমবার ছেলে অসীম নয়। এই বয়সেই অনেক বেয়াড়া বাঁকাচোরাকে বশ মানাতে সে শিখেছে।

এগিয়ে গিয়ে ঠিক-মাত্রামাফিক হাসিটি টেনে সে কাগজের নামের সঙ্গে নিজের পরিচয় দিলে।

কাগজের নামেই কাজ হয়ে গেল কিনা কে জানে!

নীরজা দেবীর চোখের ভ্রুকুটি অন্ততঃ মিলিয়ে গেল। জিজ্ঞাসা করলেন—কি চান? কণ্ঠে প্রসন্নতা না থাক রূঢ়তা নেই।

এখানে দাঁড়িয়ে বলব,—অসীম বিনীত—একটু যদি সময় দেন!

সোফারের খুলে-ধরা দরজাটার দিকে তাকিয়ে নীরজা দেবী বললেন,—বেশ আসুন তাহলে।

নীরজা দেবী নিজেই আগে গিয়ে উঠলেন। তাঁর পিছু পিছু অসীম। বড় দামী গাড়ি কিন্তু সেকেলে। নরম গদিটার কোমল অভ্যর্থনায় তাই সামান্য একটু ত্রুটি বসার সঙ্গে সঙ্গেই অসীম টের পেল। গদিতে একটা তালি আছে নিশ্চয়। সেইটেই উরুর নিচে ফুটছে।

দুই

ওপরে সভা তখনও চলছে।

কে একজন উঠে যাকে বলে জ্বালাময়ী বক্তৃতা দিচ্ছেন। ভাষার পঙ্গুতা আর বক্তব্যের অভাব পূরণ করে দিতে চাচ্ছেন কণ্ঠের জোরে। পঁচিশজনেব সভা নয়, যেন মনুমেণ্টের তলায় বক্তৃতা দিতে দাঁড়িয়েছেন।

জয়ার অসহ্য লাগে।

তবু উঠে যেতে পারে না। শ্রোতাবিরল হয়ে এ সভা আরো পরিহাস-করুণ হয়ে উঠবে সে কথা ভেবে যে ওঠে না তা নয়; উমাপতির ছবিটার ওই বিষণ্ণ কৌতুকের দৃষ্টিই যেন তাকে ধরে রেখেছে। যেন বলছে, অত তাড়া কিসের? প্রহসনটা শেষ পর্যন্ত দেখে যাও।

কিন্তু সত্যিই কি প্রহসন? এই পঁচিশজনের মধ্যে অন্তত পাঁচজন তো সত্যিকার কিছুর টানে এসেছে, তা সে শ্রদ্ধাভক্তি বা বিদ্বেষ যাই হোক।

. আর সে হিসেবে সব স্মৃতি-সভাতেই তো কোথায় একটা প্রহসনের আভাস আছে। মহাকালকে উপেক্ষা করার করুণ ব্যর্থ চেষ্টার হাস্যকর প্রহসন। স্মৃতি নয়, স্রোতই সব। সেই স্রোতই আছে ও থাকবে। নাম দিয়ে যা চিহ্নিত, তা শুধু একটা ঢেউ-এর ছলকানি। হয়ত একটা জলবিম্ব তুলে খানিকক্ষণ ভাসিয়ে রাখতে পারে মাত্র। তারপর সব একাকার। স্রোতকেই শুধু তাই সমৃদ্ধ করা যায়। তাইতেই একমাত্র সার্থকতা।

কথাগুলো তার নিজের নয়। উমাপতির কাছেই শুনেছিল মনে হচ্ছে। কিন্তু ঠিক এই ভাষায় নয়।

কথাগুলোও কি এই ?

জোর করে বলতে পারবে না। উমাপতির সব কথা অত স্পষ্ট বোঝা যায় না। জয়া অন্তত পারত না।

কথা উমাপতি খুব বেশী বলতই বা কোথায় ? না, বলত বটে এক এক দিন। হঠাৎ যেন সেদিন কথার ঝড় উঠত তার মনে। অনেক দিনের অনেক রুদ্ধ কথার অগ্ন্যুদ্গার। তারপর আবার সব শান্ত।

প্রথম যেদিন দেখা পেয়েছিল, সেদিন অন্তত উমাপতি একটা কথাও তার সঙ্গে বলেনি মনে আছে।

নিশীথ পাত্রই নিয়ে গেছলেন।

উমাপতির সেই কাগজের অফিস। কলকাতার অতি প্রাচীন একটি পাড়ায় নোংরা সঙ্কীর্ণ গলির ভেতর বোধহয় সিপাই যুদ্ধের আমলের একটি জীর্ণ বাড়ির অপ্রশস্ত একটি দোতালার ঘর।

শ্রী সৌষ্ঠব কোথাও নেই। না বাইরে না ভেতরে।

একটা তক্তপোষ, ক'টা টিনের চেয়ার, একটা ছোট বেঞ্চি, আর একদিকে একটা সস্তা কাঠের টেবিলের ওধারে একটা টুল। সেই টুলের ওপরই বসে উমাপতি কাজ করে। দরকারী ও অদরকারী ছেঁড়া ও আস্ত কাগজপত্রে আর লোকের ভীড়ে ঘরে তিল ধারণের জায়গা নেই। যেমন ঘরের চেহারা তেমনি মানুষগুলোরও। মানুষ বলতে ছেলেছোকরাই বেশী। কিন্তু কি সব বকাটে বাউণ্ডুলে হাঘরের মত দেখতে।

এরা সব এখানে এসে জুটেছে কি করে ?

এরাই কি উমাপতির আসল বাহন ?

জয়ার বেশ খারাপ লেগেছিল।

নিশীথ আর জয়া ঘরে ঢুকতে টেবিলের এধারের ছোট বেঞ্চিটা ছেড়ে দুজন উঠে দাঁড়িয়েছিল।

উমাপতি নিশীথবাবুকে দেখে একটু হেসে অভ্যর্থনা করেছিল, আসুন প্রপিতামহ।

বেঞ্চিতে তারা দুজন বসবার পর উমাপতি আবার বলেছিল—ভারত যুদ্ধে কি সত্যিই অস্ত্র ধারণ করবেন না ?

জয়া পরে জেনেছিল নিশীথবাবু সম্বন্ধে উমাপতির এটা পুরনো রসিকতা। নিশীথবাবুকে তখনই সে প্রপিতামহ ভীষ্ম বলে সম্বোধন করে। পরিহাসের সুরে শ্রদ্ধা জানাবার এই ধরনটাই উমাপতির নিজস্ব।

উমাপতির চোখে তখনও সেই কৌতুকের দৃষ্টি ছিল। কিন্তু তা তখনও বিষণ্ণ নয়।

নিশীথবাবু জয়ার পরিচয় করিয়ে দিয়ে বলেছিলেন, এ মেয়েটি তোমার কঠোর সমালোচক, তোমার বিরুদ্ধে ওর অনেক অভিযোগ। তাই ওকে নিয়ে এলাম।

উমাপতি তার দিকে চেয়ে একটু হেসেছিল মাত্র। কিছু বলেনি।

নিশীথবাবু আবার বলেছিলেন, ওর বেশ লেখার হাত আছে। তবে তোমার কাগজে বোধহয় লিখতে রাজি হবে না।

উমাপতি তখনও জয়াকে কিছু বলেনি। নিশীথবাবুকেই সম্বোধন করে বলেছিল—আপনি আমার দুর্গে সব শত্রু ঢোকাচ্ছেন !

নিশীথবাবু হেসেছিলেন। তাঁর সেই প্রাণখোলা ঘরের ছাদ ফাটানো হাসি। তারপর বলেছিলেন, লুকিয়ে চুরি করে তো নয়, বলে কয়েই ঢোকাচ্ছি। শত্রু না হলে তোমার যে আবার সাড়া জাগে না। আর তা ছাড়া বাইরের চেয়ে ঘরে শত্রু পুষে রাখা ভালো। 'সসর্পে চ গৃহে বাস'-তেই তো বাঁচার উত্তেজনা।

নিশীথবাবু আবার হেসেছিলেন। তার সঙ্গে উমাপতির চেলা-চামুণ্ডারাও।

উমাপতি শুধু হাসেনি। কেমন অদ্ভুতভাবে জয়ার দিকে খানিক চেয়ে থেকেছিল।

হার মানবে না বলে জয়াও চোখের দৃষ্টি ফেরায়নি। সটান সোজা জেদ করে চেয়েছিল। কিন্তু ভেতরে ভেতরে অস্বস্তির তার সীমা ছিল না অত্যন্ত স্পষ্টভাবে মনে আছে।

বাইরে থেকে রাজনীতির রাজ্যের কেষ্ট বিষ্টু না হোক শ্রীদাম সুদাম গোছের একজন আসায় কথার মোড় ও সকলের মনোযোগ অন্য দিকে যাওয়ায় সে যেন বেঁচে গেছল।

উঠে এসেছিল কিছুক্ষণ বাদে নিশীথবাবুর সঙ্গেই।

নিশীথবাবু যাবার সময় বলেছিলেন, শত্রুর সঙ্গে মোকাবিলা করে দিলাম। এখন ইচ্ছে হয় তো বোঝাপড়া কোরো।

ব্যস। প্রথম দিন ওইটুকুই।

জয়া চমকে বর্তমানে ফিরে আসে। সভা তো শেষ হয়ে এসেছে।

বিপিন ঘোষ উমাপতির স্থায়ীভাবে স্মৃতি রক্ষার জন্যে কি একটা প্রস্তাব করেছেন। নিশীথবাবু তাতে প্রতিবাদ করছেন প্রবলভাবে। উমাপতির এরকমভাবে কোন স্মৃতিরক্ষার চেষ্টা যেন না হয় এই তাঁর বক্তব্য। এরকম আয়োজন তার স্মৃতির প্রতি অপমান। উমাপতি নিজে এসবে বিশ্বাস করত না শুধু নয়, একান্ত বিরোধী ছিল।

নিশীথবাবুরই জয় হল।

সভা শেষ হয়ে সবাই উঠে যাচ্ছে একে একে। জয়াও উঠল।

বাইরে বৃষ্টিটা যেন থেমেছে মনে হচ্ছে।

সিঁড়ির দিকে যেতে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়তে হল। নিশীথবাবুকে ধরে ধরে আনা হচ্ছে। সত্যিই শরীরটা তাঁর এবার ভেঙে পড়েছে। হাঁটার ধরন দেখে বোঝা যাচ্ছে পায়ে আর তেমন জোর পান না। কারুর ওপর ভর দিয়ে চলতে হয়।

কিন্তু শরীর ভাঙলেও মনটা যে ভাঙেনি তা তো তাঁর বক্তৃতাতেই টের পাওয়া গেল।

ইন্দ্রিয়গুলোও যে সজাগ আছে, তার প্রমাণ পেতেও দেরী হল না।

জয়া এক পাশে সরে দাঁড়িয়েছিল, নিশীথবাবুর রাস্তা করে দেবার জন্যে। আড়ালে যাবার দরকার বোধ করেনি। বিশেষ কেউই যখন তাকে চিনতে পারেনি, তখন নিশীথবাবু বার্ধক্যের ক্ষীণ দৃষ্টিতে কি আর তাকে চিনতে পারবেন!

কিন্তু নিশীথবাবুই পারলেন।

দুপাশে দুজনের ওপর ভর দিয়ে যেতে যেতে হঠাৎ মুখ তুলে তার দিকে তাকিয়ে থেমে গেলেন। তাঁর সঙ্গে আরো দু'চার জন যারা আসছিল তারাও থামল একটু বিস্মিত হয়ে।

নিশীথবাবুর মুখে কোন কথা নেই, শুধু নীরবে জয়ার মুখের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে আছেন।

আর চুপ করে থাকা চলে না।

জয়া নীচু হয়ে নিশীথবাবুর পায়ের ধুলো নিলে।

নিশীথবাবু নিঃশব্দে তার মাথায় হাত দিয়ে আবার সহায়দের ওপর ভর দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছিলেন, কিন্তু সিঁড়ির প্রথম ধাপে নেমেই কি মনে করে ফিরে দাঁড়ালেন।

জয়ার দিকেই তাকিয়ে বললেন—আয় আমার সঙ্গে।

আমি···আমায় যেতে বলছেন···? জয়ার কণ্ঠে সত্যিকার দ্বিধা ও সঙ্কোচ।

হ্যাঁ, তোকেই আসতে বলছি। বলছি না, হুকুম করছি। আয়।

আর কোনো আপত্তি চলল না। জয়াকে তাঁর পেছনেই সিঁড়ি দিয়ে নামতে হল।

তিন

গাড়িতে উঠে বসবার পর যে অনুভূতিটা হয়েছিল নীরজা দেবীর, বাড়িতে গিয়ে বৈঠকখানায় বসার পরও সেটা সংশোধন করবার কারণ ঘটল না।

প্রকাণ্ড প্রাসাদগোছের বাড়ি। সদর রাস্তার ধারে গেট আছে, গেট দিয়ে এক দিক দিয়ে গাড়ি ঢোকবার ও গাড়ি-বারান্দার নিচে দিয়ে আর এক দিক দিয়ে বার হবার কাঁকর ফেলা রাস্তা আছে।

সে অর্ধ-বৃত্তাকার রাস্তার ধারে পাতাবাহার ও অন্যান্য নানা ফুলগাছের সারও আছে, গন্ধে না হোক এই বাদলার রাতে ধীরে ধীরে ঘুরে যাওয়া মোটরের হেড লাইটে অন্তত তার পরিচয় পাওয়া যায়।

সদর দেউড়িতে দারোয়ান আছে, গাড়ি-বারান্দার নিচেও সসম্ভ্রমে এসে গাড়িব দরজা খুলে ধরার উর্দি পরা বেয়ারা।

সেখান থেকে বৈঠকখানায় গিয়ে বসলে সারা দেওয়ালে দেখবার মত ছবি আছে। আছে কোণে কোণে পাথবের আর ব্রোঞ্জের মূর্তি। আর নানা সম্ভবত দামী ও বিরল দেশ-বিদেশের শিল্পের টুকিটাকি। আছে এ ঘরের সঙ্গে বেমানান, বেশ পুবানো ফ্যাশানের অথচ আরাম দেওয়া সোফা সেটি, আর ঘরের মাঝখানে শ্বেতপাথরের টেবিল।

অর্থাৎ সবই প্রায় আছে। তবু কি যেন নেই।

সব কিছুই যেন কেমন স্তিমিত কুণ্ঠিত, বর্তমানের সামনে নিজেদের মেলে ধবার সমাচীনতা সম্বন্ধে দ্বিধাগ্রস্ত।

অসীম একটি প্রশস্ত সোফায় নিজেকে এলিয়ে দিয়ে এই কথাই ভাবছিল।

নীরজা দেবী তাকে বৈঠকখানায় বসিয়ে রেখে সম্ভবত বেশ পরিবর্তনের জন্যেই ভেতরে গেছেন।

ইতিমধ্যে একজন বেয়ারা এসে ছোট একটি টিপয় কাছে টেনে দিয়ে তার ওপর চায়ের সরঞ্জাম সমেত ট্রে-টা রেখে গেছে।

ট্রে-তে শৌখীন ঢাকনা মুড়ি দেওয়া টী-পট থেকে পেয়ালা চামচ চিনির আর দুধের বাটি পর্যন্ত সব কিছুতেই বনেদী রুচির ছাপ। বনেদী কিন্তু কেমন একটু ফ্যাকাশে জীর্ণতার আভাস।

অসীম চায়ের ট্রে-তে হাত দেয়নি।

নীরজা দেবী ঘরে ঢুকে সেই কথাই জিজ্ঞাসা করলেন,—কই চা নেননি এখনো ?

বলার ধরনে শুষ্কতাও নেই যেমন তেমনি অনুরোধের আতিশয্যও।

এখন আবার চা পাঠালেন কেন ?—অসীম সম্মান রাখতে ওঠবার ভঙ্গি করে বললে।

বসুন। বসুন।—অসীমেরই সোফার অন্য প্রান্তে বসে নীরজা দেবী বললেন, স্মৃতিসভায় গিয়ে তো আর চা জোটেনি। তাই পাঠালাম। চা কি খান না ?

খাই।—বলে আর দ্বিরুক্তি না করে টিকোসি তুলে অসীম পেয়ালায় চা ঢালল। এখানে লৌকিকতায় সময় নষ্ট করলে তার আসল কাজ পিছিয়ে যাবে। কপি শেষ করে বাড়ি যেতে দেরী হয়ে যাবে অনেক।

ভদ্রতার খাতিরে তবু একবার বললে, পেয়ালা তো দেখছি একটাই। আপনার ?

আমি চা খাই না।

সহজভাবেই কথাটা বলে নীরজা দেবী যেভাবে তার দিকে তাকালেন তাতে বোঝা গেল জেরার জন্যে তিনি এখন প্রস্তুত।

অসীমকেই কি কি কেমন ভাবে জিজ্ঞাসা করবে মনের মধ্যে গুছিয়ে নেবার জন্যে একটু সময় নিতে হল।

সাহায্য পাওয়া গেল চায়ের পেয়ালাটা থেকেই। দুধ চিনি মিশিয়ে

সেটা নাড়তে নাড়তে সে ভূমিকাটাও তৈরী করে ফেলে নীরজা দেবীর দিকে ফিরল।

নীরজা দেবী বেশ পরিবর্তন করেই এসেছেন। কিন্তু সে পরিবর্তন লক্ষ্য করবার মত কিছু নয়।

যা পরে সভায় গেছলেন তারই মত দামী অথচ সাদাসিধে চেহারার একটি শাড়ি। না বদলে এলেও কোন ক্ষতি ছিল না।

অনেক কালের অভ্যাসের দোষেই বোধহয় বদলাতে হয়েছে।

পোশাক না বদলালেও নীরজা দেবী আর কিছু বদলে এসেছেন স্পষ্টই।

সেটা তাঁর ভঙ্গি।

সেই ঈষৎ অবজ্ঞার কাঠিন্য আর নেই, তার জায়গায় একটু সহজ প্রসন্নতা।

অসীম তারই সুযোগ নিয়ে শুরু করল,—দেখুন, আপনাকে যেটুকু জ্বালাতন করছি তাতেই আমার বাধছে। কিন্তু বুঝতেই তো পারছেন (অসীম তার সেই পেটেণ্ট অনেক সাধনায় নিখুঁত করে তোলা অব্যর্থ অমায়িক হাসিটি মুখে টানল) খবরের কাগজে চাকরি করি। দু'চারটে নতুন কিছু যদি রিপোর্টে না দিতে পারি তাহলে কর্তাদের কাছে আর কদর থাকে না। উমাপতি ঘোষাল সম্বন্ধে আপনার মত কে আর জানে বলুন···

নীরজা দেবী বাধা দিলেন,—হয়ত আমার মত সৌভাগ্য আরো কারুর কারুর হয়েছে।

হেসে এ বাধাটাকে পাশ কাটিয়ে অসীম অন্য রাস্তা নিলে,—কিন্তু যদি বা সেরকম কেউ থাকেন তাঁদের চেয়ে আপনার কথার দাম যে অনেক বেশী। যেমন আপনি যে আজ এই স্মৃতিসভায় গেছলেন তাই একটা শিরোনামা দেওয়ার খবর। এই সঙ্গে উমাপতি ঘোষালের জীবনের দু'একটা রিপোর্টে দেওয়ার মত খবর যদি জানান···

অসীম কথাটা অসমাপ্তই রাখলে যেন কি বলবে ঠিক করতে না

পেরে থতমত খেয়ে। এই থতমত ভাবটা সে অনেক জায়গায় কাজ হাসিল করতে লাগায়।

নীরজা দেবী সেটা লক্ষ্য করলেন কিনা তা কিন্তু বোঝা গেল না।

বললেন,—আপনাদের খবরের কাগজে যা দেওয়া যায় তা বোধহয় আমার চেয়ে আপনি বেশী জানেন।

গলায় রূঢ়তা নেই, কিন্তু একটু যেন বিদ্রূপের আভাস।

অসীম একটু প্রমাদ গণল মনে মনে।

যতটা সোজা শিকার ভেবেছিল তা নয় বোঝা যাচ্ছে।

পাঁয়তাড়া কষতে কিন্তু আর বেশী সময় দেওয়া যায় না।

একটু বিমূঢ় ভাব দেখিয়ে বললে,—আপনার চেয়ে আমি বেশী জানি!

আপনি কেন আরো অনেকেই জানে। তার ওপর আপনি তো খবরের কাগজের লোক! উমাপতি ঘোষাল যে আঠারো বছর বয়সে বিপ্লবী হিসেবে দ্বীপান্তরে গেছলেন, তিনি যে···

তাড়াতাড়ি বাধা দিয়ে অসীম বললে,—না, না ওসব খবরের কথা বলছি না। ওসব তো সবাই জানে। তাঁর শেষ জীবনের কিছু খবর চাইছিলাম। যে জীবনটা তাঁর ধীরে ধীরে লোকচক্ষের নেপথ্যে হারিয়ে গেছে, যে জীবনের কথা আপনার চেয়ে বেশী কেউ জানে না বলে আমার বিশ্বাস।

অসীম উৎসুক ভাবে নীরজা দেবীর দিকে চাইল।

নীরজা দেবী তবু নিরুত্তর। কিরকম একটু অদ্ভুত দৃষ্টিতে অসীমের দিকে চেয়ে আছেন।

অসীম আর একটু ব্যাকুলতা ঢালল গলায়,—আপনাকে সোজাসুজি কোন প্রশ্ন তাই আমি করছি না। সে ধৃষ্টতা আমার নেই। আপনি যা জানেন নিজে থেকে তার যেটুকু বলবেন তাতেই আমি কৃতার্থ হব।

নীরজা দেবী এবার একটু হাসলেন, তারপর শান্ত অথচ দৃঢ় স্বরে

বললেন,—আপনি খবরের কাগজে ছাপবার মশলা চাইছেন। কিন্তু আমি যা জানি তা'ত খবরের কাগজে ছাপা যাবে না।

কেন?—অসীম এবার সত্যিই বিমূঢ়।

কেন?—নীরজা দেবীর মুখের হাসিটা ধীরে ধীরে যেন ক্রূর হয়ে উঠল,—যেহেতু আমি ছাড়া আর কেউ সাক্ষী না থাকায় সে সব কথা কেউ বিশ্বাস করবে না। আর বিশ্বাস যদি করে তাহলে উমাপতি ঘোষালের যে ছবিটা প্রায় মুছে গিয়েও মানুষের মনে কিছুটা এখনো টিকে আছে তা একেবারে বদলে যাবে। সেই বদলে যাওয়াটা আমি চাই না।

এ আবার কি হেঁয়ালি? এতক্ষণ ধরে ধন্না দিয়ে সাধ্যসাধনাটা কি তাহলে পণ্ডশ্রম!

সহজে বিচলিত হওয়া যার স্বভাব নয় সেই অসীম একটু যেন ধৈর্য হারালো।

কিন্তু ধৈর্য হারালে তো চলবে না।

এতখানি সময় অপব্যয়ের বদলে একটু কিছু আদায় না করে নিয়ে যেতে পারলে তো নিজের কাছেই সে ছোট হয়ে যাবে। তার সমস্ত অহঙ্কার ধূলিসাৎ হয়ে নিজের ক্ষমতাতেই তার অবিশ্বাস আসবে।

নিজেকে সামলে নিয়ে অসীম যথাসম্ভব দ্বিধাগ্রস্তের ভান করে বললে,—আপনি কি বলছেন ঠিক বুঝতে পারছি না। উমাপতি ঘোষালের জীবনের শেষ ক'টা বছর সম্বন্ধে সত্য মিথ্যা মিলিয়ে কিছু রটনা অনেকেই আমরা শুনেছি। কিন্তু ওই টাকাকড়ি সংক্রান্ত ব্যাপারটা ছাড়া অন্য কিছু ঠিক বিশ্বাস করতে পারিনি। তাঁর এমন কি কিছু গ্লানির ব্যাপার সত্যিই ছিল যা এখন প্রকাশ পেলে…

নীরজা দেবী অসীমকে কথাটা শেষ করতে না দিয়ে হঠাৎ অদ্ভুত ভাবে হেসে উঠলেন। তারপর হাসতে হাসতেই বললেন,—গ্লানি! খবরের কাগজের লোক হয়ে আপনি উমাপতির গ্লানির কথা জিজ্ঞেস

করছেন ? গ্লানি যাকে আপনারা বলেন তা কি তাঁর আগের জীবনে কখনো ছিল না ?

অসীম কিছু বলবার মত ভেবে ওঠবার আগেই নীরজা দেবী আবার বললেন,—একটা নতুন খবর শুধু আপনাকে দিতে পারি কাজে লাগাবার মত। দেউলে বলে নাম লেখাবার পরও উমাপতি আমার সব পাওনা শোধ করে দিয়েছিলেন। কি করে দিয়েছিলেন তা জানি না—কিন্তু শোধ করেছিলেন কড়ায় গণ্ডায়।

এ কথা তো কেউ জানে না।—অসীম অভিভূতের মত বললে,—আপনিও তো জানাননি।

না জানাইনি।—নীরজা দেবী হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেলেন,—জানানো আমার দায় নয়। তা ছাড়া—তা ছাড়া উমাপতিরই বারণ ছিল।

উমাপতিরই বারণ ছিল ? নিজের তুর্নামটা দূর করার বদলে তিনি নিজেই সেটা জাগিয়ে রাখতে চেয়েছিলেন ?

নীরজা দেবীব এ বিষয়ে বক্তব্যটা শোনবার সৌভাগ্য আর অসীমের হল না।

সুন্দরী দীর্ঘাঙ্গী একটি মেয়ে হঠাৎ ঘরে ঢুকে পড়ে তীক্ষ্ণ কণ্ঠে ডাকলে,—মা! আজ উমাপতির স্মৃতিসভা ছিল! তুমি গিয়েছিলে ?

অসীম যথারীতি উঠে দাঁড়িয়েছে তখন।

নীরজা দেবী কন্যাকে বোধহয় থামাবার উদ্দেশ্যেই তাড়াতাড়ি পরিচয় করিয়ে দিতে ব্যস্ত হয়ে উঠলেন,—এই আমার মেয়ে মলি মানে মলয়া, আর ইনি হলেন একজন সাংবাদিক শ্রী···

অসীম তখন ভদ্রতার নমস্কারে হাত তুলেছে। নিজেই নামটা বললে,—অসীম রাহা।

মলি বা মলয়া অগ্রাহ্যের সঙ্গে হাত দুটো তুলল কি না তুলল বোঝা গেল না। অসীমকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে সে তেমনি তীক্ষ্ণ অভিযোগের স্বরে মার দিকে ফিরে বললে,—কই, আমায় তো বলোনি!

নীরজা দেবী একটু অস্বস্তির সঙ্গেই অসীমের দিকে চকিতে একবার চাইলেন।

কই কিছু বলছ না যে!—মলয়ার গলার ঝঙ্কারে মনে হল অসীম তার কাছে ঘরের একটা আসবাবপত্রের বেশী কিছু নয়।

গতিক বুঝে অসীম নিজেই বিদায় নেবার ব্যবস্থা করলে,—আচ্ছা আমি তাহলে এখন আসি নীরজা দেবী। অনেক ধন্যবাদ আপনাকে। নমস্কার। নমস্কার মলয়া দেবী।

নীরজা দেবী হাত তুলেই বিদায় নমস্কার জানালেন।

মলয়ার হাত উঠল না। শুধু মুখে একটা দ্রুত জড়িত নমস্কারের মত শব্দ অস্পষ্টভাবে শোনা গেল।

অসীম ততক্ষণে বাইরের গাড়ি-বারান্দার নিচে পৌঁছে গিয়েছে।

আজকের সন্ধ্যাটা তার একেবারে বৃথাই গেল। কিন্তু সত্যি সম্পূর্ণ বৃথা কি?

একেবারে সব চেয়ে হালফ্যাশানের শৌখিন মহিলাদের কাগজ থেকে যেন সদ্য বেরিয়ে আসা, এমন একটি বিশেষ আধুনিকার সে দেখা পেয়েছে যার আজকের আকস্মিক ও অদম্য রাগ ও উত্তেজনার পেছনে কিছু রহস্য না থেকে পারে না।

সে রহস্য খুঁড়ে বার করবার জন্যে তার সমস্ত ঔদ্ধত্য ও তাচ্ছিল্য অনায়াসে সহ্য করা বোধহয় যায়।

মলয়া সুন্দরী বটে, কিন্তু যুবতী তাকে আর বেশী দিন বলা যাবে বলে মনে হয় না। কুড়ির চেয়ে ত্রিশেরই সে কাছাকাছি সন্দেহ নেই।

উমাপতির স্মৃতিসভায় যাওয়ার জন্যে মার বিরুদ্ধে তার অত তীব্র অভিযোগ কেন?

নীরজা দেবী পরলোকগত উমাপতির কোনো সংস্রবে থাকেন তা পছন্দ করে না বলে-ই কি?

কিন্তু গলার ওই ঝঙ্কারটা সামান্য একটু অপছন্দের সঙ্গে মেলানো কি যায় ?

তাহলে আসল রহস্যটা কোথায় ?

যেখানেই থাকুক অসীম রাহা তা খুঁড়ে বার করবেই। আজকের দিনের ব্যর্থতা তার দরকাব ছিল। এই ব্যর্থতাব শোধ সে তুলবে।

কে জানে কাঁচ কুড়োতে গিয়ে হীরের খনিরই সে সন্ধান পেয়েছে কি না !

চার

নিশীথ পাত্র এখনও তাঁর সেই পুরনো বাড়িটিতেই আছেন যে বাড়িতে তাঁর সঙ্গে জয়ার প্রথম পরিচয় হয়েছিল।

শহরের এক প্রান্তে বাড়িটি এখনও তেমনি আছে। সেই টিনের চাল দেওয়া দুটি ছোট ছোট ঘর আর সামনে লাল সিমেন্টের রক। ঘর দুটির চারিধারে দেওয়াল ঘেরা উঠোন। উঠোনের এক কোণে গোয়াল, আর একদিকে টালিতে ছাওয়া ছোট্ট একটি রান্নাঘর আর টিউবওয়েল।

এই টিউবওয়েলটাই যা নতুন। আগে ছিল একটা পাতকুয়া।

পাতকুয়াটি ছাড়া বাড়িটির আর বিশেষ কিছু অদল বদল হয়নি। কিন্তু বাড়িটি না বদলালেও পাড়াটা সম্পূর্ণভাবে বদলেছে।

সে ফাঁকা মাঠের নির্জনতা আর নেই। চারিধারে ছোট বড় নানা ছাঁদের নতুন নতুন বাড়ি। সবই কোঠা বাড়ি এবং প্রায় প্রত্যেকটিই দোতালা কি তেতালা।

নিশীথ পাত্রের বাড়িটিই হংসো মধ্যে বকের মত এখন এ অঞ্চলে বেমানান।

সে যুগে যখন শহর ছেড়ে এত দূরে এসে প্রায় বন জঙ্গল মাঠের মধ্যে নিশীথ পাত্র বাসা বেঁধেছিলেন, তখন শুভানুধ্যায়ীরা অনেকে অনুযোগ করে বলেছে,—এই বন-বাদাড়ে এসে শেষে বাড়ি করলেন! শহরে আর জায়গা ছিল না?

নিশীথ পাত্র হেসে বলতেন,—থাকবে না কেন? সে তোমাদের মত শহুরেদের জন্যে। আমি গাঁইয়া মানুষ, ত্রিশ বছর বয়সে প্রথম কলকাতা দেখেছি। আমি ওখানে থাকলে কোনদিন গাড়ি চাপাই পড়ে মরব আর তোমাদের শহরে আমার যদি বা জায়গা হয় আমার এই গরু ছাগল হাঁসের জায়গা মিলবে কি?

এখন যারা অনুযোগ করে তারা সবই প্রায় অনুগত ভক্তের দল। নিশীথ পাত্রের সমবয়সীরা বেশীর ভাগ একে একে এ জীবন থেকে বিদায় নিয়ে গেছেন। যে দু'চারজন আছেন তাঁদের উৎসাহ করে এতদূর আসার ক্ষমতা নেই।

এখন যারা অনুগত তারা আর বন-জঙ্গলে থাকার কথা বলে না। বলে,—বাড়িটা ভেঙে একটা দোতালা দালান তুলুন পাত্র দা। বড় বেমানান লাগে এ পাড়ায়।

হ্যাঁ আমি দোতালা তুলে এ বয়সে সিঁড়ি ভাঙতে ভাঙতেই মারা যাই এই তোরা চাস্!—বলে নিশীথ পাত্র হাসেন।

আচ্ছা আর কিছু না করেন, টিনের চালটা পাল্টে অন্তত পাকা ছাদ করুন। লোকে যে আপনাকে কঞ্জুস বলে।

বলে না কি?—নিশীথ পাত্রের সেই নিজস্ব ছাদফাটানো হাসি এখনও শোনা যায়,—চোর জোচ্চোর কালোবাজারী তো বলে না। তোদের কোন ভাবনা নেই। মরবার সময় কোথায় টাকা পুঁতে রেখেছি সব বলে যাবো। খুঁড়ে বার করে নিস্।

নিশীথ পাত্র কঞ্জুস হন বা না হন তাঁর যে টাকার আণ্ডিল আছে এ গুজব জয়া সেই প্রথম পরিচয়ের সময়েই শুনেছিল।

থাকা আর আশ্চর্যই বা কি! দেশে যে তাঁর বিরাট প্রায় ছোটখাট রাজবাড়ির সম্পত্তি তিনি ছেড়ে এসেছেন এ কথা কে না জানত।

সে সম্পত্তির কিছু আয় কি তাঁর ভাগে এখনও আসে না! সে আয়ের ছিটেফোঁটাতেই তো টাকার পাহাড় জমবার কথা।

অত টাকা নিয়ে সত্যি নিশীথ পাত্র করেন কি?

শুধু কৃপণের মত জমিয়েই যান!

তাঁর চাল চলন প্রকৃতির সঙ্গে এই কৃপণতা কিন্তু মেলে না।

তাঁর চরিত্রের আর আচরণের অনেক কিছুতেই অমনি গরমিল। জয়া সেই প্রথম পরিচয়ের সময়েই বুঝতে পেরে কৌতূহলী হয়েছিল।

নিশীথ পাত্র আজীবন ব্রহ্মচারী নিষ্কলঙ্ক চরিত্রের আদর্শনিষ্ঠ পুরুষ। এমন মানুষের নীতিবোধ অত্যন্ত কঠোর ও অনমনীয় হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু তাঁর সংস্পর্শে যারা এসেছে তাদের কারুর কারুর যে ধরনের স্খলন পতন তিনি অকাতরে উপেক্ষা করে গেছেন তা প্রায় বিশ্বাসাতীত।

তিনি নিজে অহিংসাবাদী দেশসেবক। কিন্তু তাঁর সাঙ্গপাঙ্গদের মধ্যে কোন মতের লোকই বাদ নেই।

সারাজীবন ঘনিষ্ঠভাবে দেশের সমস্ত বড় বড় নেতার সঙ্গে যুক্ত থেকেও সুযোগের দিনে তিনি একটি সামান্য পদগৌরবও কখনও নিতে রাজী হননি। অসামান্য জনপ্রিয়তা ও প্রভাব সত্ত্বেও কোন নির্বাচনেও কখনও দাঁড়াননি।

গাড়িতে নিশীথ পাত্রের পাশে বসে আসতে আসতে জয়া এইসব কথাই ভাবছিল।

অনেক দিন এ জগৎ থেকে সে নিজেকে সরিয়ে নিয়েছে। কিন্তু খবর তু'একটা তা সত্ত্বেও পায় বই কি?

নিশীথ পাত্র যে কয়েকবছর আগে দেশের প্রধান রাজনৈতিক দল থেকেও সরে দাঁড়িয়েছেন আজীবন সংস্রবের পর, সে খবরও সে জানে।

কয়েক বছর আগে, মানে কবে?

উমাপতির সেই চরম লাঞ্ছনার সময় থেকেই কি?

অনুগত ভক্তের দল গাড়িতে নিশীথ পাত্রের দরজা পর্যন্ত পৌছে দিয়ে গেল।

বাড়িতে ঢুকতে সাহায্য করবার জন্যে তুজন এগিয়ে এসেছিল। নিশীথ পাত্রই তাদের নিরস্ত করলেন। বললেন,—না না জয়া আছে। ওই টেনে হিঁচড়ে নিয়ে যাবে। কিরে, পারবি তো?

জয়া মৃত্থু হেসে বললে—পারব।

নিশীথ পাত্রের মনের ইচ্ছাটা বুঝে অনুগতের দল চলে গেল।

জয়ার কাঁধে ভর দিয়ে বাড়ির ভেতর যেতে যেতে নিশীথ পাত্র বললেন,—তোর ফিরতে একটু রাত হয়ে যাবে। তাতে আর কি হয়েছে? এখন তো জমজমাট পাড়া। সেই ভূশণ্ডীর মাঠ যখন ছিল তখনই তো কতবার রাত দুপুরে ট্যাঙ্গস্ ট্যাঙ্গস্ করতে করতে এখান থেকে একা গেছিস্!

জয়া উত্তর না দিয়ে হাসল। একবার ইচ্ছে হয়েছিল বলে,—সে জয়া কি আর আছে?

সে জয়া আর সত্যিই কি নেই? তাই তো মনে হয়।

কোথায় গেল সে জয়া, কোথায় কবে গেল হারিয়ে?

জায়গা তারিখ বলতে পারবে না, কিন্তু একদিন হারিয়ে গেছে নিশ্চিতই।

না, একদিনে হারায়নি, হারিয়ে গেছে ধীরে ধীরে যেমন করে বুঝি অনেকেরই উৎসুক নির্ভীক জীবনের সূচনা হারিয়ে যায়। হারিয়ে যায় হতাশার ক্লান্তিতে, নিজের প্রতি, নিজের সমস্ত গভীর প্রেরণার প্রতি অবিশ্বাসে। কখনও আবার লোভের মধ্যেও হারায়, সুলভ সাফল্যের উত্তেজনার মধ্যে, প্রতিষ্ঠা খ্যাতির নেশার আচ্ছন্নতায়।

জয়া হারিয়ে গেছে ব্রতভঙ্গের মসৃণ স্থূল সার্থকতার পথে নয়, শুধু হতাশার ক্লান্তিতেও বলা চলে না। তার আত্মবিলুপ্তি ঘটেছে কেমন একটা সংশয়ের স্তিমিত গোধূলি জগতে যেখানে পথের স্থিব নিশানা সব মুছে একাকার হয়ে যায়, যেখানে চলার সার্থকতা সম্বন্ধেই সন্দেহ আসে, এগিয়ে যাওয়া আর পিছিয়ে থাকার মানেই যায় গুলিয়ে।

আগুনের স্ফুলিঙ্গের মত একটি মেয়ে মফস্বলের এক নগণ্য শহর থেকে কলকাতায় পড়তে এসেছিল। থাকত মেয়েদের হোস্টেলে। অধ্যাপকদের চমকে দিত বুদ্ধির তীক্ষ্ণ ঝিলিকে, বন্ধু সহপাঠিনী, সঙ্গীদের প্রাণের প্রাচুর্যে।

তার ভেতরে এক উদ্দাম বন্যাবেগ, যা কোন্ পথ যে নেবে তাই নির্ণয় করতে পাবে না।

দিগ্বিদিকে তাই সে হানা দেয় নির্বিচার উচ্ছলতায়।

আর্টস নিয়ে পড়তে এসেছিল কলেজে।

বদলে নিল বিজ্ঞান।

তখনকার দিনে অত অসুবিধা কি কড়াক্কড়ি ছিল না।

বললে, বিজ্ঞানই এ যুগের ধর্ম। সে ডাক্তাবী পড়বে।

ডাক্তাবী পড়ে মেয়েবা শুধু দাইগিরিই কবে। সেরকম ডাক্তার নয়, পুরুষদের ক্ষেত্রে পাল্লা দেওয়া ডাক্তার।

তবে গবেষণা নিয়ে তন্ময় হয়ে থাকতে চায় না। সে সেবা করতে চায় সেই গ্রামাঞ্চলে যেখানে ডাক্তারী শেখার মজুবী ওঠে না বলে কেউ নিরুপায় না হলে যেতে নাবাজ।

এসব তখনকার দিনের মামুলি আদর্শবাদ ছাড়া অবশ্য কিছু নয়।

কিন্তু তার সব উৎসাহ আদর্শ এমন মামুলি নয়।

শাড়ি ছেড়ে সালোয়ার পাঞ্জাবি পরে একদিন কলেজে গেল।

এখন সেটা অতি সাধাবণ ব্যাপাব। কিন্তু তখন একেবারে আচমকা বলে অত্যন্ত দৃষ্টিকটু।

আপত্তি উঠল কোথাও কোথাও। ঠাট্টা বিদ্রূপও।

সে গ্রাহ্যই করলে না। বললে,—ঢিলে পোশাক বলেই এদেশেব মেয়েবা অমন ঢিলে ন্যাতনেতে।

চুলটাও একদিন ছেঁটে ছোট করে ফেললে। বব্ নয়, কারণ তার তরিবৎ সে জানবে কোথা থেকে।

এ বিষয়েও তাব বক্তব্য হল যে, চুলেব প্রসাধনেই অর্ধেক সময় যদি যায় তো আর কিছু ভাববে কখন।

একদিন কিন্তু নিজেই আবাব এসব ছেড়ে শাড়ি ধরে চুল বাড়তে দিলে। বললে,—এ ধরনেব বিদ্রোহে একটা বাহাদুরীর মোহ থাকে। তাতে হুজুক যতটা হয় কাজ হয় না। বিদ্রোহ করতে

হলে বড় কিছু নিয়ে করা দরকার। এসব সস্তা চালাকি যাদের আর কিছু করবার নেই তাদের জন্যে।

অন্য যা কিছুই করুক পড়াশোনা সে অবহেলা করেনি কখনও।

কলেজের প্রথম ধাপ সে সসম্মানেই পেরিয়ে গেল। কিন্তু তার পরেই বাধল গোল।

প্রথমে যে হোস্টেলে থাকত, তার কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বিরোধ ছোটখাট নিয়ম কানুন নিয়ে।

জয়া ঔদ্ধত্য দেখাল না কারুর বিরুদ্ধে, কিন্তু হোস্টেল ছেড়ে দিয়ে একটা হোটেলে গিয়ে উঠল।

তখনকার দিনে সেটাও অবিশ্বাস্য।

হোটেলে থাকা নিয়েও কথা উঠল। কলেজ কর্তৃপক্ষের কানে কথাটা গেল।

মেয়েদের কোন আত্মীয় অভিভাবকের বাড়ি কি নির্দিষ্ট হোস্টেলে ছাড়া আর কোথাও থাকবার নিয়ম নেই।

জয়া কলেজই ছেড়ে দিলে হঠাৎ সকলকে অবাক করে।

তখনও নিঃসম্বল নয় বলেই সেটা করতে পেরেছিল।

প্রচুর না হোক দিন চালাবার মত আর্থিক সঙ্গতি তার তখন ছিল।

বাপ মা ছেলেবেলাতেই মারা গেছেন। মানুষ হয়েছে মামার বাড়িতে। অকালে মারা গেলেও বাবা তার ভরণপোষণ, লেখাপড়া শেখা ও বিবাহের খরচের জন্যে বেশ কিছু রেখে গেছেন। মামার বাড়ি থেকে একটা মাসোহারা তাই থেকে আসত। সেইটেই তার স্বাধীনতার ভিত্তি।

কিন্তু সে ভিত্তিও বেশীদিন রইল না। কলেজ ছেড়ে দেওয়ার কথা শুনে মামা অসন্তুষ্ট হয়ে চিঠি লিখলেন। অবিলম্বে আবার কলেজে ভর্তি হতে বললেন।

জয়া কথা রাখল না।

মামা লিখে পাঠালেন, কলেজে যদি ভর্তি না হয় জয়া যেন দেশে ফিরে আসে।

জয়া তাও গেল না।

মামা একটু ভয় দেখাবার জন্যেই লিখলেন, ফিরে না এলে জয়ার মাসোহারা তিনি আর পাঠাতে পারবেন না। জয়ার পরলোকগত পিতার অন্তরের বাসনার কথা মনে বেখেই তাঁকে এ কাজ করতে হবে।

চিঠিতে ভয় দেখালেও যথাসময়ে তিনি মাসিক বরাদ্দ পাঠালেন।

জয়া সেটা গ্রহণ না করে ফিরিয়ে দিলে।

নিজের দিন চালাবার একটা উপায় সে তখনই করে ফেলেছে।

করপোরেশন স্কুলের একটা চাকরি।

দু'তিন দফা টাকা ফেরত যাওয়ার পর মামা ব্যাকুল হয়ে কলকাতায় এলেন তাকে বোঝাতে।

জয়া রাগারাগি করল না, মামাকে অসম্মানও না। শুধু দৃঢ়তার সঙ্গে জানিয়ে দিলে,—এখন তার কোন মাসোহারার দরকার নেই। আর এক বছর বাদেই সে সাবালিকা হবে। তখন তো পাবে সবকিছুই।

মামাকে দুঃখও দিল না। তাঁর সঙ্গে একবার দেশে গিয়েও ঘুরে এল।

কিন্তু প্রতিজ্ঞা তার অটল। আর কলেজে সে পড়বে না।

মামা মামীমা বিয়ের কথা পাড়লেন। সে হেসে সে প্রসঙ্গ এড়িয়ে গেল।

মামাত বোন পেড়াপীড়ি করায় মিথ্যে করে বানিয়ে বললে।—বিয়ে তার একজনের সঙ্গে ঠিক হয়ে আছে। ভদ্রলোক বিলেতে গেছেন বড় চাকরির ট্রেনিং নিতে। ফিরে এলেই শুভকার্য সম্পন্ন হবে।

স্কুলের চাকরির খাটুনি নেই এমন নয়। কিন্তু খাটুনি জয়া গ্রাহ্য করে না। আরো অজস্র কাজে সে নিজেকে ঢেলে দিলে।

মেয়েদের একটা সাঁতার শেখবার ব্যবস্থা তখন হয়েছে। সেখানে ভর্তি হল সাঁতার শিখতে। বিজ্ঞানের ছাত্রী হঠাৎ সংস্কৃত নিয়ে মেতে উঠল। সংস্কৃত না জানলে ভারতবর্ষের আত্মাকেই জানা যায় না এই তাঁর তখন মত! একজন প্রবীণ পণ্ডিতের বাড়ি গিয়ে একেবারে ভারতীয় দর্শনের পাঠ নিতে শুরু করলে।

তখনই সে একটু আধটু লিখতে আরম্ভ করেছে।

মেয়েলী মিষ্টি লেখায় তার ঘৃণা। সাধারণ গল্প উপন্যাস কবিতা নয়, লিখল, জোড়ালো ঝাঁঝালো অথচ তথ্যবহুল প্রবন্ধ। সমাজ রাজনীতি সবকিছু নিয়ে।

সেই সময়ে নিশীথবাবুর সঙ্গে পরিচয়। মস্ত বড় পণ্ডিত কি নামকরা কর্মী নয়, দেখলে অতি সাধারণ সহজ মানুষ মনে হয়।

কিন্তু প্রথম পরিচয়েই জয়া মুগ্ধ হয়ে গেল।

বিদ্যা বুদ্ধি প্রতিভারও ওপরের একটা কিছু এমন আছে যাতে মানুষকে দেবতা ভাবতে ইচ্ছা হয়। সেটা কী বুঝিয়ে বলতে পারা যায় না। কিন্তু সেই জিনিসই নিশীথ পাত্রের মধ্যে পেয়ে সে অভিভূত। তাঁর কাছে গিয়ে বসলে সংহত শক্তি ও বিশাল প্রশান্তির এমন একটা সমন্বয় অনুভব করা যায় যার তুলনা অভ্রভেদী পাহাড় কি অকূল সমুদ্রের মত প্রাকৃতিক বিস্ময়ের মধ্যেই শুধু মেলে।

কেউ যা পারেনি জয়ার সেই মতবদল নিশীথ পাত্রই করালেন।

জয়া আবার পড়তে রাজী হল।

বিজ্ঞান নয়, আর্টসেরই প্রাইভেট ছাত্রী হিসাবে পরীক্ষা দিলে। উত্তীর্ণও হল সসম্মানে।

মামা মারা গেলেন সেই সময়েই।

সাবালিকা হয়ে জয়া তখন তার পৈতৃক টাকা হাতে পেয়েছে। মামাত বোনের বিয়েতেই তার বেশ কিছু নিজে খরচ করলে। বাকিটা জমা করে রেখে দিলে ব্যাঙ্কে দীর্ঘদিনের মেয়াদে।

নিশীথ পাত্রই সে পরামর্শ দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, শুধু টাকার

পেছনে ছোটাও যেমন খারাপ টাকাকে ঘেন্না করাও তেমনি। প্রয়োজনের বেশী টাকা যদি পাস্ তা তোর কাছে গচ্ছিত আছে মনে করিস। আর খবরদার, কাউকে যেন কিছু কখনো দয়ার দান করিসনি।

কেন একথা বলেছিলেন ঠিক বুঝতে পারেনি তখন।

সে কতকাল আগের কথা।

উমাপতি ঘোষালের নাম তখন সবে নানাদিকে ধ্বনিত হতে শুরু করেছে। দীর্ঘ নির্বাসনের বিস্মৃতিবিলীন দিগন্ত থেকে প্রতিদিন উজ্জ্বলতর হয়ে তিনি মধ্য আকাশের দিকে উঠে আসছেন।

কি উত্তেজনা তখন আকাশে বাতাসে। শুধু উমাপতিই তার একমাত্র কারণ নয়।

তাকে সঙ্গে করে নিজের ঘরে নিয়ে গিয়ে নিশীথ পাত্র সেইসব দিনের কথাই হয়ত বলবেন জয়া ভেবেছিল।

স্মৃতির রোমন্থন নিশীথ পাত্রের প্রকৃতিবিরুদ্ধ বলেই অবশ্য সে জানত।

কিন্তু বৃদ্ধ হওয়ার সঙ্গে আনুসঙ্গিক কিছু দুবলতা আসা তো স্বাভাবিক।

তা ছাড়া আজকের দিনে নিশীথ পাত্র যে একটু বেশী বিচলিত হয়েছেন তা তো গোড়া থেকেই বোঝা গেছে।

নিশীথবাবু কিন্তু সেসব কথার ধার দিয়েই গেলেন না।

ঘরে নিয়ে গিয়ে তাঁর নিচু চওড়া চৌকির মত আসনের ওপর বসিয়ে দেবার পর শ্রীহরি বলে হাঁক দিলেন।

শ্রীহরি এসে দাঁড়াতে শুধু বললেন,—বুঝেছিস তো!

শ্রীহরি খোঁচা খোঁচা কাঁচা পাকা দাড়িওয়ালা ফোকলা মুখে এক গাল হেসে বললে,—আজ্ঞে বুঝেছি। জয়া দিদিমণি আজ খেয়ে যাবেন এখানে!

জয়া অবাক হয়ে বললে,—তুমি আমায় চিনতে পেরেছ শ্রীহরি! আমার নামটাও মনে রেখেছ?

আমি কেন ভুলে যাব দিদিমণি। আমার তো আপনাদের মত একরাশ বই কেতাব মুখস্থ রাখতে হয় না যে এসব ভুলে যাবো। —বলে শ্রীহরি চলে গেল।

শ্রীহরি নিশীথ পাত্রের অনেক কালের পুরনো লোক। তাঁকে দেখাশোনা করবার একমাত্র লোক বলা যায়। আর লোকজন যা থাকে তারা অস্থায়ী। শুধু শ্রীহরিই চিরন্তন।

নিশীথ পাত্র তখনকার দিনে ঠাট্টা করে বলতেন,—তোকে কেন এখানে কাজ দিয়েছি জানিস শ্রীহরি ?

আজ্ঞে জানি বই কি !—শ্রীহরি তখন গম্ভীর হয়ে বলত,—এমন তামুক সাজতে কেউ পারবেক নাই।

শ্রীহরির গাঁইয়া টান তখনও যায়নি। তার কথায় সবাই হেসে উঠত। নিশীথ পাত্র রাগের ছলে বলতেন,—ওঃ হতভাগার দেমাক দেখো ! এমন তামুক সাজতে কেউ পারবে না ! আমি তামাক খাই হতভাগা !

আজ্ঞে আমার হাতের সাজা একবার খেয়ে দেখেন কেনে ? আর ছাড়তে পারবেন নাই।

আচ্ছা। আচ্ছা তোর হাতের সাজা তামাকের ধোঁয়াতেই এমন সুনামটায় কালি লাগাব'খন ! কিন্তু তোকে সে জন্যে কাজ দিইনি। দিয়েছি শুধু তোর নামটুকুর জন্যে। দিনে দু'শবার তোকে তো ডাকতে হয়। যদি অজামিলের মত ওই নাম ডাকেই তরে যাই।—বলে নিশীথ পাত্র তাঁর সেই নিজস্ব প্রাণখোলা হাসি হাসতেন।

শ্রীহরি ঠিক বুঝতে না পেরে কেমন একটু ভ্রুকুটি করে চলে যেত।

তখন শ্রীহরির ভালো করে দাড়ি গোঁফও গজায়নি। আজ সে নিশীথবাবুর কাছেই বুড়ো হতে চলেছে।

এতদিন অমন অনেক কাজের লোক হয়ত টিকে থাকে অনেক বাড়িতেই। কিন্তু শ্রীহরির বেলা সেটা একটু আশ্চর্য।

শ্রীহরির পেছনের একটু ইতিহাস আছে, ভয় পাওয়ার মত ইতিহাস।

জয়া নিশীথবাবুর কাছেই শুনেছিল। নিশীথ পাত্র একদিন হাসতে হাসতে কাকে বলেছিলেন,—ওকে একটু সাবধানে ঠাট্টা বিদ্রূপ কোরো কিন্তু। আমার ঠাট্টাতেই ও এক এক সময়ে চোখ রাঙা করে ফেলে। একটার জায়গায় দুটো খুন করে ফেলতে ওর কতক্ষণ!

একটার জায়গায় দুটো!—সবাই অবাক হয়েছিল।

ও, তোমরা বুঝি জানো না। ও যে খুনের মামলায় খালাস আসামী। আমিই চেষ্টাচরিত্র করে খালাস করিয়েছিলাম।

নিশীথ পাত্র তারপর সংক্ষেপে কাহিনীটা বলেছেন।—শ্রীহরি দেশের কোন এক জমিদারী কোম্পানীর বড়কর্তার খাস চাকর ছিল। সে জমিদারী কোম্পানীর অংশীদার আবার ছিল—বেশীর ভাগ সাহেবসুবো। যেমন জবরদস্ত কোম্পানী, তেমনি সাংঘাতিক তার বড়কর্তা। এদেশী হয়েও সে মনিবদের চেয়ে বেশী কড়া। একদিন সেই বড়কর্তাকে তাঁর শোবার ঘরে মৃত অবস্থায় পাওয়া যায়। লোহার ডাণ্ডা দিয়ে কে তার খুলি দু' টুকরো করে দিয়েছে। বড়কর্তার বাংলোয় থাকত শুধু শ্রীহরি। সে তখন ফেরারী। ফেরারী হয়ে আর ক'দিন থাকবে! শ্রীহরি ধরা পড়ল। তার বিচারও হল। কিন্তু প্রত্যক্ষ সাক্ষীর আর প্রমাণের অভাবে কোনরকমে বিচারে সে ছাড়া পেলে।

তাহলে ওই যে মেরেছে তার কোন প্রমাণ নেই?—একজন আশ্বস্ত হবার জন্যেই বলেছিলেন।

না, প্রমাণ কিছু নেই।—বলে মাথা নেড়ে যেভাবে নিশীথ পাত্র হেসেছিলেন তাতে আসল ব্যাপারটা বুঝতে কারুর বাকি ছিল না।

জয়াই সন্ত্রস্ত হয়ে বলেছিল,—আর ওই খুনেকে আপনি ডেকে এনে ঘরে পুষছেন!

না, না এ অত্যন্ত অন্যায় !—অন্যেরাও সমর্থন করেছিল।

নিশীথ পাত্র হেসে বলেছিলেন,—পুষলে তো বাঘই পুষতে হয়। খরগোশ পুষে সুখটা কি ?

বাঘই যদি হয় তাহলে সেও নিশীথ পাত্রের সঙ্গে থেকে তার স্বভাব বদলে বশ হয়েছে বলতে হবে।

নেহাৎ দু'চারজন যারা জানে তারা ছাড়া শ্রীহরির এ ইতিহাস কেউ তার চেহারায় কি ব্যবহারে কল্পনা করতেও পারবে না।

নিশীথ পাত্রকে কিছুটা বুঝতে হলে শ্রীহরিকে কিন্তু বাদ দেওয়া যায় না।

শ্রীহরি চলে যাবার পর জয়া মৃদু আপত্তি জানিয়ে একবার বললে,—আপনাকে বলা অবশ্য বৃথা। কিন্তু খেয়ে দেয়ে যেতে কত রাত হয়ে যাবে বুঝতে পারছেন।

তা আর পারছি না। খুব পারছি। কিন্তু এতদিন যে আসিস নি এ তার শাস্তি। আমি তো ভেবেছিলাম তুই মরেই গেছিস, কি বিয়ে থা করে সংসারী হয়েছিস। এখন বুঝছি, ভুল।

বিয়ে থা করে সংসারী যে হইনি তা কি করে জানলেন ?—জয়া হাল্কা সুরে বলবার চেষ্টা করলে।

জানলাম বিয়েতে আমায় নেমন্তন্ন করিসনি বলে। তা ছাড়া তোর চেহারাই বলে দিচ্ছে ও বরাত তোর হয়নি।

বরাতই যদি হয় তাহলেও বিয়ের কথা কি চেহারায় লেখা থাকে ?—হেসে জিজ্ঞাসা করলে জয়া।

থাকে রে থাকে। দুঃখের বিয়ে হলেও থাকে, সুখের হলেও। পৃথিবীতে কারুর সঙ্গে যে নিজেকে বাঁধতে পারলি নে সে তোর চোখ দুটোই জানিয়ে দিচ্ছে।

একটু চুপ করে থেকে জয়া প্রায় ধরা গলায় বললে,—না, বিয়ে থা করিনি নিশীথদা। আপনার প্রথম কথাই সত্যি। আমি সত্যিই মরে গেছি। মরে গেছি বলেই আর আসতে পারিনি।

নিশীথ পাত্র কিন্তু কিছুতেই সুরটাকে গাঢ় হতে দিলেন না। হেসে সেটাকে লঘু করে দিয়ে বললেন,—মরে গেলেও আসবি। পেতনী হয়ে আসবি। আমি তো আজকাল ভূত পেতনী নিয়েই থাকি রে। নিজেই যে কবে ভূত হয়ে গেছি বুঝতে পাবিনি।

এই ধরনের আধা পরিহাসের আলাপই চলল শেষ পর্যন্ত।

নিশীথ পাত্র একবার ভুলেও কোন পুবনো কথায় ফিরে গেলেন না।

কিন্তু শেষ বেদনাব আঘাতটা তিনি যেন জোব করে চেপে রেখে দিয়েছিলেন বিদায়ের মুহূর্তের জন্যে। তাঁর অনিচ্ছাতেও যেন হঠাৎ তা প্রকাশ পেয়ে গেল।

খাইয়ে দাইয়ে গাড়ি ডাকিয়ে বাড়ি পাঠাবার সময় হঠাৎ গম্ভীর হয়ে বললেন,—তুই খবর পাসনি একথা আমি বিশ্বাস করি না। পেয়ে থাকলে একবার শুধু গিয়ে দাঁড়াতে পাবতিস। একেবারে নিভে যাওয়ার আগে শুধু একটা কথাই বলেছিল—বলেছিল অতি কষ্টে শরীরের সমস্ত ফুরিয়ে আসা শক্তি যেন সংগ্রহ করে,—ভালোই হয়েছে জয়া আসেনি।

পাঁচ

বিপিন ঘোষ সকালে উঠে বিছানায় শুয়ে শুয়েই খবরের কাগজগুলো দেখছিল। হ্যাঁ, প্রায় সব কাগজেই কিছু না কিছু বিবরণ দিয়েছে। কেউ সাধারণ শিরোনামায় ছোট হরফে। কেউ বা একটু ফলাও করে। বড় দুটি কাগজেব একটিতে সম্পাদকীয় হিসেবেও একটা প্যারা আছে। মামুলি ছাঁচে ঢালা। কতকটা বেগার ঠেলা গোছের। কিন্তু অন্যটিতে সম্পাদকীয় না দিলেও স্মৃতিসভার বিবরণটিকে যথেষ্ট প্রাধান্য দিয়েছে। দু'কলম জোড়া হেড লাইন। বিবরণও প্রায় পুরো এক কলম।

লেখাটা ভালো। সেই অসীম রাহা বলে ছোকরার লেখা বলেই মনে হয়। অসীম রাহা সভায় যে এসেছিল তা বিপিন ঘোষ লক্ষ্য করেছে।

অসীম রাহা বিবরণটা সাজিয়েছে কায়দায়। নিশীথ পাত্রের কথাগুলোকেই সব চেয়ে মর্যাদা দিয়ে সভায় লোক না হওয়াটাকেই ইঙ্গিতময় করে তুলেছে। উপস্থিতদের মধ্যে বিপিন ঘোষের নাম দেয়নি। উদ্যোক্তা হিসেবেও নয়।

তা না দিক। বিপিন ঘোষ ওই প্রভৃতির আগে নাম বসাবার জন্যে ব্যাকুল নয়। এখন নেপথ্যে থাকতেও তার আপত্তি নেই। শুধু তার উদ্দেশ্য সিদ্ধি হলেই হল।

উমাপতি ঘোষালকে আবার একটা কিংবদন্তী করে তুলতে হবে।

সে কিংবদন্তীতে শুধু নিষ্কলুষ উজ্জ্বলতা যদি না থাকে তাতেই বা ক্ষতি কি?

আলোছায়া দিয়েই সে ছবি আঁকা হোক। সব সুদ্ধ জড়িয়ে একটা রহস্যের কুজ্ঝটিকা।

সাবধানে ধীরে ধীরে বিপিন ঘোষ তার অভিযানে অগ্রসর হবে। তার হাতে যথেষ্ট মশলা আছে। একটু একটু করে সে তা ছাড়বে।

. প্রথমে কয়েকটা চিঠি। আজ যারা ক্ষমতা প্রতিপত্তির শিখরে নিশ্চিন্ত হয়ে বসে আছে তাদেরই কয়েক জনের কাছে প্রায় নির্দোষ কয়েকটা চিঠি। সেগুলো শুধু জমি তৈরী করবার জন্যে ; ইঙ্গিত দেবার জন্যে যে এর পর আরো আছে।

টনক অনেকেরই তাতে নড়বে নিশ্চয়। অন্তত উপেক্ষা করতে পারবে না নির্বিকার ভাবে ।

কাউকে কাউকে ছুটে আসতেই হবে তার কাছে প্রতিষ্ঠার ভিত্তি পর্যন্ত ধ্বসে যাবাব ভয়ে।

সেই সুযোগের জন্যে বিপিন ঘোষ অপেক্ষা করে আছে। সে সুযোগকে যতখানি সম্ভব নিংড়ে সে নেবেই। ছোট লাভের লোভে অস্থির হয়ে কিছু করবে না। অসীম ধৈর্য নিয়ে অপেক্ষা করবে পুরো দাম আদায় কববার জন্যে।

উমাপতি ঘোষাল প্রায় ভুলে যাওয়া একটা নাম। তা বিস্মৃতির অন্ধকারে হারিয়ে গেছে বলে অনেকে এখন নিঃশঙ্ক নিশ্চিন্ত।

উমাপতি ঘোষাল বেঁচে থাকতেই অনেকের হিসেব-নিকেশের খাতা থেকে খারিজ হয়ে গিয়েছিলেন।

খারিজ করবার উৎসাহ উমাপতিই দিয়েছিলেন নিজেকে সব কিছু থেকে সরিয়ে নিয়ে। তাঁর মৃত্যুর পর হিসাবের খাতাটাই বাতিল হয়ে গেছে মনে করা স্বাভাবিক।

বিপিন ঘোষ বুঝিয়ে দেবে যে জীবিত উমাপতির চেয়ে মৃত উমাপতির দাম কত বেশী।

উমাপতি তাঁর সমস্ত ব্যক্তিগত কাগজপত্র মৃত্যুর পব তাঁর সঙ্গে পুড়িয়ে দিতে বলে গিয়েছিলেন বিপিন ঘোষকে ।

বিপিন ঘোষ তা দেয়নি। উমাপতিকে কথা দেওয়ার সময়েই মনে মনে এ সংকল্প সে করে নিয়েছিল।

উমাপতির সমস্ত ব্যক্তিগত কাগজপত্র ও জিনিস ভালো করে খুঁজে দেখবার এখনও সে সময় পায়নি। ওপর ওপর একটু নেড়ে চেড়ে যা পেয়েছে তাই বড় কম মূল্যবান নয়। যা পেয়েছে তার চেয়ে অনেক দামী জিনিস এখনও নিশ্চয় অনাবিষ্কৃত আছে।

তাতে কয়েকটা লুপ্ত সূত্রের অন্তত সন্ধান পাওয়া যাবে বলে তার বিশ্বাস। সেই সূত্র ধরে অপ্রত্যাশিত কিছুতে পৌঁছে যাওয়া মোটেই অসম্ভব নয়।

নীরজা দেবীর সঙ্গে এখন একবার যোগাযোগ করলে মন্দ হয় ন'। কাল নীরজা দেবী যে সভায় এসেছিলেন তা তাব দৃষ্টি এড়ায়নি। সভা শেষ হবার আগেই যে উঠে গেছেন তাও।

কেন তিনি এ সভায় এসেছিলেন তা আর কেউ অনুমান করতে না পারুক সে পারে বোধহয়।

ওই স্মৃতিসভা সম্পর্কেই নীরজা দেবীর সঙ্গে দেখা করা যেতে পারে।

এখন আর নীবজা দেবী উদ্ধতভাবে দরজা থেকে ফিরিয়ে দেবেন বলে মনে হয় না। ফিরিয়ে দেবার কথা যাতে ভাবতেই না পারেন সে ব্যবস্থা করেই সে যাবে।

প্রথমে শুধু একটু ফোন করা,—উমাপতিবাবুর রেখে যাওয়া জিনিসপত্র সব আমায় দেখতে হচ্ছে। আপনার কাছে দামী হতে পারে এমন কিছু কিছু তার মধ্যে পাচ্ছি। সেগুলো কি আপনি ফেরত চান ?

না, ফোন চলবে না। বিপিন ঘোষেব নাম শুনে হয়ত ফোন ধরতেই চাইবেন না।

চিঠি। ছোট একটি সাধারণ চিঠি। তাতে বিনীতভাবে জানানো যে, উমাপতি ঘোষালের কাগজপত্র ও অন্যান্য জিনিসের মধ্যে নীরজা দেবীর কাছে মূল্যবান হতে পারে এমন কিছু কিছু আছে বলে মনে হচ্ছে। নীরজা দেবী ইচ্ছা করলে সেগুলি চেয়ে পাঠাতে পারেন।

বিপিন ঘোষ বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ল।

চিঠিটা আজকেই লিখে ফেলা দরকার।

রামবাবু অসীম রাহাকে ডেকে পাঠিয়েছেন। নিউজ এডিটর রামবাবু।

দুপুরে অফিসে এসে রামবাবুর ঘরে একবার কাজ বুঝে নিতে যাওয়া নিয়ম। অসীম নিজে থেকেই যেত।

কিন্তু আজ অফিসে নিজেদের ঘরে গিয়ে বসতে না বসতেই খবর পেয়েছে রামবাবু তাকে খুঁজছেন। এলেই দেখা করতে বলেছেন।

অসীম একটু উদ্বিগ্ন হয়েই গেল।

হঠাৎ এমন জরুরী তলবের মানে কি ?

বড় কোন কাজের বরাত দেওয়াও হতে পারে অবশ্য। কিন্তু রামবাবুব চরিত্র তো তেমন নয়। উত্তেজিত অস্থির হওয়া কাকে বলে তিনি জানেন না। সব কিছুরই ওপব তীক্ষ্ণ সজাগ দৃষ্টি আছে, কিন্তু প্রথম পাতা জুড়ে শিরোনামা দেওয়ায় খবর পেয়েও যেমন, অতি তুচ্ছ সাতেব পাতার নিচের চার লাইনের পাদপূরণের বেলাতেও তেমনি নির্বিকার।

এখুনি ছুটে যাওয়ার মত ব্যাপার হলে তার জন্যে অপেক্ষা করতেন না। সে আসার আগেই কাউকে এতক্ষণে পাঠিয়ে দিতেন।

যাক, হাতে পাঁজি থাকতে মঙ্গলবার কেন ? যা জানবার এখুনি তো জানা যাবে।

অসীম কাটা দবজা ঠেলে ভেতবে ঢোকে।

রামবাবু একবার মুখ তুলে তাকিয়ে আবার যে ছাপা শীটটায় লাল পেন্সিলের দাগ লাগাচ্ছিলেন তাতেই মনোনিবেশ করেন।

বসতে বলার ভদ্রতা-টদ্রতার তিনি ধার ধারেন না। ইচ্ছে হয় বোসো না হয় দাঁড়িয়ে থাকো। কিছুতেই ভ্রূক্ষেপ নেই।

অসীম নিজে থেকেই সামনের একটা চেয়ারে বসে।

যা জানবার তা কিন্তু তখুনি জানা যায় না।

রামবাবু দাগ মারা সেরে কলিং বেল টেপেন। বেয়ারা এসে দাঁড়াতে তার হাতে কাগজটা দিয়ে তার পর অসীমের দিকে মুখ তুলে তাকান। তাকিয়ে খানিকটা চুপ করেই থাকেন। কি বলতে চেয়েছিলেন যেন ভুলে গেছেন মনে হয়।

কিছু যে তিনি ভোলেন না অসীম তা জানে। তাঁর দরকারী কথা বলার ওইটে ভূমিকা। ভাষায় কিছু বলার বদলে নীরবতা।

অসীম অপেক্ষা করে।

কাল কপি দিতে দেরী হয়েছিল?—রামবাবুর এটা ঠিক প্রশ্ন নয়, উক্তি। আসল বক্তব্যও এটা নিশ্চয় নয়।

একটু হয়েছিল। সভা থেকে আর এক জায়গায় গেছলাম বিশেষ কিছু পাওয়া যায় কি না দেখতে।—অসীম সহজভাবে বলার চেষ্টা করে।

কোথায় অসীম গেছল তা রামবাবু ছাড়া আর কেউ হয়ত প্রশ্ন করত। রামবাবু তা করেন না। আবার একটু নীরব থেকে বলেন,—লেখাটা বড় হয়ে গেছে। এক কলম করার দরকার ছিল না।

এইটেই কি আসল বক্তব্য?

অসীম ঠিক বুঝতে পারে না।

কৈফিয়ৎ দেবার চেষ্টা করে বলে,—আমি তাহলে ভুল বুঝেছিলাম। ভেবেছিলাম নামটা যখন লোকে প্রায় ভুলেই গেছে তখন শেষবার স্মরণ করিয়ে দেবার জন্যে একটু বেশী কিছু দেওয়া বোধহয় দরকার।

বেশী কিছু দিতে পেরেছ কি?

না, তা অবশ্য পারিনি। কিছু কিছু এমন আছে যা দেওয়া যায় না বলেই মনে হয়েছে। আবার কয়েকটা ব্যাপার ভালো করে খোঁজ না নিয়ে দেওয়া উচিত নয়।

ভালো করে খোঁজ নিতে পারবে? তেমন সূত্র কিছু পেয়েছ?

অসীম একটু অবাক হয়ে বলে,—হ্যাঁ তা পেয়েছি। খোঁজ করতেও পারব। কিন্তু আর কি তার দরকার হবে?

হবে। ছাপবার জন্যে নয়। লোকে যা ভুলে গেছে তা ভুলেই যাক। কিন্তু আমাদের নিজেদের জন্যে সময় থাকতে যা কিছু পাওয়া যায় সংগ্রহ করে রাখতে হবে। পারবে?

অসীমকে একটু ভেবে উত্তর দিতে হয়। বলে,—কত দিনের মধ্যে চাই?

যত দিনের মধ্যে পারো। ধরাবাঁধা সময় নেই।

রামবাবুর কথার ধরনে ও বেল টেপায় বোঝা গেল যা বলবার তিনি শেষ করেছেন।

অসীম উঠে বেরিয়ে গেল। মনটা তার একটু দমেই গেছে তখন। উমাপতি ঘোষালের কাহিনী তন্ন তন্ন করে খুঁজতে তার আপত্তি নেই। বরং আগ্রহই হয়েছিল গতকাল নীরজা দেবীর সঙ্গে সাক্ষাতের পর।

কিন্তু যা মুদ্রিত পৃষ্ঠাব মুখ দেখবে না, গোপনে লোকচক্ষুর আড়ালে কোন দেরাজেব খোপে চাপা হয়ে থাকবে তার সম্বন্ধে বিশেষ কোন উৎসাহ সে অনুভব করে না।

সে জাহির করতে চায় নিজের ক্ষমতাকে, চমকে দিতে চায় পাঠক সাধারণকে। সেই চমক লাগানোর ভেতর দিয়েই তার উন্নতির সোপান। যে কাজের কথা কাউকে জানানো যাবে না তা'ত এক হিসেবে পণ্ডশ্রম মাত্র।

রামবাবু ও কর্তৃপক্ষ হয়ত খুশী হবেন, কিন্তু সে খুশীর নগদ মূল্য কিছু পাওয়া যাবে কি?

উমাপতি ঘোষালের স্মৃতিসভায় যাওয়াটাই তার জীবনের অশুভ যোগ বলে মনে হয়।

ছয়

জয়া স্কুলের কাজ সেরে বাসায় ফিরছে।

বাসে অসম্ভব ভীড় নিত্যকার মত। এ ভীড় তার সয়ে গেছে। অন্যদিন সে খেয়ালও করে না। কিন্তু আজ যেন অসহ্য মনে হচ্ছে। অসহ্য আজ সব কিছুই লেগেছে। স্কুলে গিয়ে এতটুকু কাজে মন দিতে পারেনি। শুধু যন্ত্রচালিতের মত পড়িয়ে গেছে। অন্যমনস্কও হয়ে গেছে তার মধ্যে। একটি মেয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বলছে,—আমার খাতাটা দেখবেন না?

জয়ার খেয়াল হয়েছে। মেয়েরা খাতাব লেখা দেখতে দিয়েছিল। একটা তার মধ্যে দেখা বাদ পড়েছে।

ভুল আরো দু'একটাও হয়েছে। সেগুলো ঠিক অন্যমনস্কতার দরুণ নয়। মনটা কেমন ক্লান্ত অসাড় হয়ে আছে বলে। ক্লান্ত অসাড় হয়েছে আজ সকাল থেকে অপরিতৃপ্তভাবে অগভীর ঘুম থেকে ওঠার পর। এ অবসাদ আসা স্বাভাবিক হয়ত। প্রচণ্ড ঝড়ের পর একটা শূন্যময় প্রশান্তির মত।

প্রচণ্ড ঝড়ই কাল সারারাত সত্যিই গেছে। বিনিদ্র রাত কাটায়নি, কিন্তু সে বিক্ষুব্ধ আচ্ছন্নতার চেয়ে বুঝি অনিদ্রাও ভালো।

নিশীথ পাত্রকে বলেছিল জয়া মরে গেছে। নিজেও সে কথা সে বিশ্বাস করত। কিন্তু জানত না যে মৃত্যুর মাঝে হারিয়ে যাওয়া অতীত আবার জেগে উঠতে পারে শব-সাধনার মন্ত্রে।

সেই মরে যাওয়া জয়াই কাল সারারাত সমস্ত হৃদয়-চেতনা আলোড়িত করে রেখেছে।

কিসে সে জাগল? নিশীথ পাত্রের সেই শেষ একটি কথায়,—ভালোই হয়েছে জয়া আসেনি! ওই একটি কথাই শব-সাধনার মন্ত্র!

প্রচণ্ড আলোড়নে সে মন্ত্র স্মৃতির গভীর অতলতায় গিয়ে ঘাস্তুত দিয়েছে। বিলুপ্ত নিশ্চিহ্ন সব স্তর ঘুলিয়ে উঠেছে আবার। কখনও জাগরণে কখনও স্বপ্নে। অতীতের ছায়ামূর্তিরা বেরিয়ে এসেছে বিস্মরণের পর্দার পর পর্দা সরিয়ে।

বাসের ভিড় আরো বাড়ছে।

মেয়েদের সীটেই সে জায়গা পেয়েছে কিন্তু ভেতরের দিকে; জানলার ধারে নয়, মাঝখানের পথটার পাশে।

প্রত্যেকবার বাস থামা ও ছাড়ার ঝাঁকানিতে মাঝখানে ঘেঁষাঘেঁষি করে যাঁরা দাঁড়িয়ে আছেন তাঁদের কেউ কেউ একেবারে গায়ের ওপর এসে পড়ছেন।

একজন যেন একটু ইচ্ছে করেই বেশী বেসামাল হয়ে যাচ্ছেন।

জয়া একটু ভ্রুকুটি করে তাঁর দিকে ক'বার তাকাল। ভদ্রলোকেব—ভদ্রলোক ছাড়া আর কি বলা যায়—দৃষ্টি আকর্ষণ করতে কিন্তু পাবল না। তিনি যেন নির্লিপ্তভাবে অন্য দিকে চেয়ে আছেন।

জয়া ভেতবের দিকে যথাসম্ভব আরেকটু ঘেঁষে বসবার চেষ্টা করলে ভদ্রলোকের স্পর্শ এড়াতে। সরবে প্রতিবাদ জানানো যায়। কিন্তু কি হবে ও সব গোলমাল করে! এসব ব্যাপারে অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে গেলেও গ্লানির ছোঁয়াচ বাঁচান যায় না।

ভেতরের দিকে ঘেঁষে বসবাব সঙ্গে সঙ্গে অবশ্য কথাটা তার মনে হয়েছিল।

এ জয়া সে জয়া নয়।

সে জয়া কিন্তু কাল এসেছিল, এসেছিল তার প্রাণের প্রচণ্ড বেগ নিয়ে। এসে যেন তাকে নির্মম কঠিন প্রশ্ন করেছিল,—কেন আমায় হারিয়ে যেতে দিলে?

এ প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পায়নি আজকের জয়া।

সেদিনের জয়া হলে এই অভদ্রতা নীরবে মেনে নিত না। ভয়

না কেলেঙ্কারী কি গ্লানির। মনে যা সত্য বলে বোঝে তা .কাশ করতে তার দ্বিধা সঙ্কোচ ছিল না।

সেই জয়াই নিশীথবাবুর কাছে একদিন উমাপতি ঘোষালের বিরুদ্ধে সমালোচনা করতে সাহস করেছিল। উমাপতি তখন তার কাগজ বার করেছে। আবালবৃদ্ধ বিশেষ করে তরুণের দল মেতে উঠতে শুরু করেছে তাকে নিয়ে।

জয়া তীব্রভাবেই বলেছিল,—বুঝি না আপনাদের উমাপতি ঘোষালকে নিয়ে এই মাতামাতি। তাঁকেও বুঝি না। এক যুগ দ্বীপান্তরে কাটিয়ে তিনি কি শুধু এই সিদ্ধি নিয়ে ফিরলেন? বিপ্লবীর কি এই পরিণতি?

নাঃ—ভদ্রলোক বড় বাড়াবাড়ি করছেন।

জয়া উঠে দাঁড়াল একটু শিক্ষা দেবার ইচ্ছে নিয়েই। কিন্তু ক্লান্তি লাগল তাতেও, কেমন একটা ঘৃণা। কিছু না বলে জয়া বাস থেকে নেমেই গেল পরের স্টপে। অনেকক্ষণ ধরেই নামবার কথা ভাবছিল। এই অসহ্য ভিড়ের ঠেলাঠেলি সহ্য করার চেয়ে হেঁটে যাওয়াও ভালো, অন্তত আজকের দিনটায়।

আকাশের চেহারা ভালো নয়। ষ্টি একটু এখন থেমেছে কিন্তু যে কোন মুহূর্তে আবার নামতে পারে। তা নামুক। সে হেঁটেই যাবে। না হয় বৃষ্টির তোড় বাড়লে কোথাও কিছুক্ষণের জন্যে আশ্রয় নেবে, তবু নিজের সঙ্গে একা তো থাকতে পাবে।

জয়া হাঁটতে শুরু করলে।

একবার মনে হল এখান থেকে আজও আবার নিশীথ পাত্রের কাছে যায়। কিন্তু কেমন দ্বিধা হল। বুঝি তার সঙ্গে আশঙ্কাও।

যেটুকু শুনেছে তাতেই সমস্ত দিন রাত্রি তার ক্ষতবিক্ষত। আরো কি শুনবে গিয়ে কে জানে? হয়ত নিজের দুর্বলতা দমন করতে পারবে না। নিজেই আরো কিছু জিজ্ঞাসা ক'রে বসবে।

জিজ্ঞাসা যে তার সত্যি অনেক।

সে শুধু সে সব জিজ্ঞাসা স্তব্ধ করে রেখে দিয়েছে তাই। অন্তত কাল পর্যন্ত স্তব্ধ করে রাখতে পেরেছিল বলেই তার ধারণা।

সে জয়া কিন্তু কোন জিজ্ঞাসাই দমন করে রাখতে জানত না। সঙ্কোচ ছিল না তার কোন মতামত সাহস করে জানাতে।

উমাপতির বিরুদ্ধে সেদিন যা তার মনে হয়েছিল বিনা দ্বিধায় বলেছে।

নিশীথ পাত্র তার দিকে প্রসন্ন স্নেহের দৃষ্টিতে চেয়ে বলেছিলেন,—উমাপতির সঙ্গে তোর আলাপ হয়েছে? দেখেছিস তাকে?

দেখবার দরকার নেই। ইচ্ছেও নেই।—জয়া উদ্ধতভাবেই বলেছিল,—তাঁর লেখা পড়েই তাঁকে বুঝেছি।

লেখা পড়েই একটা মানুষকে চেনা যায়!—নিশীথ পাত্র হেসেছিলেন,—মানুষ তার কতটুকু ভগ্নাংশ লেখায় প্রকাশ করতে পারে? রথী মহারথী লেখকরা পর্যন্ত নয়।

একটু থেমে আবার হেসে জিজ্ঞাসা করেছিলেন,—উমাপতির লেখা কি তোর খারাপ লাগে?

সব।—অম্লান বদনে বলেছিল জয়া,—আন্দামান থেকে উনি নতুন বাণী নিয়ে এসেছেন, সুস্থ হও সুন্দর হও। তলোয়ারের ফলাকেই লাঙ্গল বানাতে হয়। যে গড়তে জানে না তার ভাঙবার অধিকার নেই। ঘরের দীপের দাম যার কাছে নেই বোমার বারুদ ঠাসায় সে অনধিকারী।—এসব কথা যেন কেউ কখনো আমরা শুনিনি।

শুনেছিস, কিন্তু উমাপতির মত মানুষের কাছে নয়। কথা সাজাতে অনেকেই পারে, কিন্তু উমাপতি নিজের জীবনকে মশালের মত জ্বালিয়ে এসব কথা বুঝতে শিখেছে।

জয়া তবু মানতে চায়নি। বলেছিল,—এসব আপনাদেব উচ্ছ্বাস। সতেরো না আঠারো বছর বয়সে তো ধরা পড়েছিল। হুজুকে পড়ে অনেকে অমন ওই বয়সে দারুণ কিছু একটা করতে চায়।

তারপর আন্দামানের ঘানি টেনে শিরদাঁড়া বেঁকে গিয়েছে। এখন শুধু আয়েশ শান্তি খুঁজে দর্শনের বুলি ধরেছেন।

এ কথার জবাব না দিয়ে কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে নিশীথবাবু হঠাৎ বলেছিলেন,—চ' তোকে উমাপতির কাছে নিয়ে যাই।

কেন ?

একবার দেখেই আসবি চল না। ভয়ের তো কিছু নেই।—নিশীথ পাত্র হেসেছিলেন।

ভয়ের কথাতেই জয়া গরম হয়ে গিয়েছিল। বলেছিল,—বেশ চলুন আজই।

তারপর সেই প্রথম উমাপতির কাগজের অফিসে গিয়ে তাকে দেখা—যে দেখায় উমাপতি একটি কথাও তার সঙ্গে বলেনি।

মুখে কিছু না বললেও তার দিকে অদ্ভুতভাবে চেয়েছিল একবার।

সে দৃষ্টির জবাবও দিয়েছিল জয়া, দিতে চেষ্টা করেছিল, কিন্তু নিজের কাছেই স্বীকার করেছিল পরে যে হার তাকেই মানতে হয়েছে।

কিসের হার তা বোঝাতে পারবে না, কিন্তু উমাপতিকে তুচ্ছ করবার ক্ষমতা যে তার নেই সেটুকু ভালো করেই টের পেয়েছিল।

বৃষ্টিটা আবার জোরেই নামল। কাছাকাছি তেমন কোন আশ্রয় নেই। কিছু দূরে একটা ট্রামের শেড।

একটু পা চালিয়ে জয়া তার নিচেই গিয়ে আশ্রয় নিলে।

এখানে আবার সেই ভীড়। তবে বাসের চেয়ে ভদ্রই বলতে হবে।

দুটি মিস্ত্রীগোছের চেহারা পোশাকের ছোকরা নিজেরা সরে গিয়ে তাকে জায়গা করে দিলে। দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে পেছনে তাদের আলাপ শোনা যাচ্ছে। ভাষায় তাদের শালীনতা নেই, কিন্তু মনে আছে বোধহয়।

উমাপতির সঙ্গে সেই দিনটার কথা মনে পড়ে গেল।

উমাপতি তখন শহর ছাড়িয়ে বহু দূরে প্রায় একটা জংলা জলার মধ্যে থাকে। জায়গাটার বেশী ভাগই জলা। সুপারী নারকেল ঘেরা সামান্য একটু উঁচু জমি তারই মাঝখানে দ্বীপের মত।

বড় রাস্তা থেকে প্রথমে একটা কাঁচা সরু তুদিকের ধেনো জমির সীমানা দেওয়া পাড়ের পথ দিয়ে অনেকখানি যেতে হয়। তাবপর সেখান থেকেও বাঁশের নড়বড়ে সাঁকো দিয়ে মাঝখানের দ্বীপটুকুর মত জায়গায়। সেইখানেই টালিতে ছাওয়া একটা মাটির কুঁড়ে উমাপতি তুলেছিল থাকবার জন্যে।

উমাপতি জায়গাটার নাম দিয়েছিল তার 'আন্দামান'।

জয়াই ঠাট্টা করে বলত,—আন্দামানের সাধ এখনো আপনার মেটেনি। এতদিন বাদে দেশে ফিরেও আন্দামানের জন্যে প্রাণ কাঁদে!

উমাপতি হেসে হেঁয়ালি করে বলত,—আন্দামানে যে সত্যি গেছে সে কি আর ফিরতে পারে। আন্দামান তার সঙ্গে সঙ্গে থাকে যে!

মানে যাই হোক জয়া হাসত।

হ্যাঁ, তখন উমাপতিকে ঠাট্টা করতে পাবার মত কাছাকাছি সে এসেছে। ঠাট্টা শুধু কেন আঘাতও।

সেটাও এমনি বৃষ্টির দিন মনে আছে। উমাপতি কি খেয়ালে শহর থেকে জয়াকে তার আন্দামানে নিয়ে যেতে চেয়েছিল। অবাক হলেও জয়া আপত্তি করেনি।

উমাপতি নিজে ট্রেনে করে কাছাকাছি একটা স্টেশনে নেমে হেঁটেই সাধারণত তার আস্তানায় যেত। সেদিন জয়ার খাতিরেই একটা ট্যাক্সি করেছিল।

রাস্তায় অসাবধানী এক পথিককে প্রায় চাপা দিতে দিতে কোনরকমে বাঁচিয়ে ট্যাক্সিড্রাইভার তার নিজস্ব ভাষায় অশ্লীল কুৎসিতভাবে গাল দিয়ে উঠেছিল মনের ঝাল মেটাতে।

জয়া আগুন হয়ে উঠে তাকে ধমক দিতে উমাপতি হেসে ফেলেছিল বেশ জোরেই।

হাসছেন যে বড় !—জয়া সরোষে তার দিকে তাকিয়েছিল।

হাসছি তোমার যাকে বলে ননীর কান দেখে। ওই ক'টা খাঁটি সাচ্চা শব্দেই ছ্যাঁকা লেগে গেল !

খাঁটি সাচ্চা শব্দ !—জয়া তীব্রস্বরে বলেছিল,—কি বলেছে আপনি শুনেছেন !

শুনেছি। দেহতত্ত্বের কয়েকটা নির্ভেজাল সত্য যা অকাতরে গালাগালের ভেতর দিয়ে বার করে দেয় বলে ওদের মনে পচা কাদা বড় একটা জমতে পায় না। ভণ্ডদের অবশ্য মনের মধ্যেই ও. কাদা পাক খায়। তা ছাড়া আমাদের মত ভাষার সম্পদ ওদের আমরা এখনো পেতে দিইনি, তাই আমরা যা ঢেকেঢুকে বিস্তারিত করে প্রকাশ করি ওরা তা কড়া ঝাঁঝ দিয়ে সারে।

কোন উত্তর না দিয়ে জয়া অনেকক্ষণ গুম হয়ে বসেছিল।

তারপর হঠাৎ অতর্কিত আক্রমণ করেছিল,—আপনি নিজেও ভণ্ডদের একজন তা জানেন ?

আঘাতটা সত্যিই অপ্রত্যাশিত।

উমাপতিব মুখে হাসি ফুটেছিল তাই একটু দেরীতে।

হেসেই বলেছিল,—তুমি যদি বুঝে থাকো তাহলে নিশ্চয়ই তাই। নিজের স্বরূপ নিজে ক'জন বুঝতে পারে !

আপনারা অন্তত পারেন। শুধু বুঝেও না বোঝার ভান করছেন। আপনি কেন আমাকেই সঙ্গে করে আপনার সেই আন্দামানে নিয়ে যেতে ব্যাকুল ? আপনি সন্ন্যাসীর ভড়ং করে থাকেন কিন্তু মেয়েদের সঙ্গ চান ! আমার মত সামান্য একটু চটক আর বয়স থাকলে তো কথা নেই। আমার সঙ্গ পাবার জন্যে কেন আপনি লালায়িত জানেন না ?

উমাপতির মুখটা সত্যিই কি রকম হয়ে গিয়েছিল। তারপর

তার কণ্ঠ দিয়ে চাপা গাঢ় জমানো আর্তনাদের মত যা বার হয়েছিল তা যেন অন্য কারো স্বর।

মুখটা জয়ার দিক থেকে ফিরিয়ে নিয়ে সে বলেছিল—জানি, সত্যিই জানি জয়া। মেয়েদের সঙ্গ আমি চাই। তোমার সঙ্গের চেয়ে কাম্য আমার কিছু নেই এখন। কিন্তু বিশ্বাস করো সন্ন্যাসীর ভড়ং আমি করি না। আমার আসল নকল সব ভক্ত আর অনুগতেরা তাদের নিজেদের স্বার্থে গোঁড়ামিতে ওই মিথ্যে ছদ্মবেশে আমায় সাজিয়ে রেখেছে। আমি সায় দিই না, প্রতিবাদও করি না, কিন্তু প্রথম যৌবনের দিনে আন্দামান যার হাড় মজ্জা শুকিয়ে ঝাঁঝরা করে দিয়েছে, জীবনের জন্যে, সুস্থ স্বাভাবিক জীবনের জন্যে কি তার আকুল তৃষ্ণা তা তোমায় শুধু যদি বোঝাতে পারতাম!

জয়া স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল বিস্ময়ে বেদনায় অনুশোচনায়।

উমাপতির এই চেহারা সে ক'বার মাত্র দেখেছে।

কিন্তু এ তো অনেক পরের কথা। তার আগে অন্য ইতিহাস আছে উমাপতির অত কাছে গিয়ে পৌঁছোবার।

বৃষ্টি ধরেছে। মেঘলা আকাশে সন্ধ্যার বিষণ্ণতা আরো গাঢ়। রাস্তার বাতিগুলো এই মুহূর্তে জ্বলে উঠল। ভিজে রাস্তার ওপর সে আলো যেন উপচে পড়ে গড়িয়ে যাচ্ছে।

এবার বাসার দিকে রওনা হওয়া যায়। কিন্তু জয়ার কিছুতেই সেখানে ফিরতে ইচ্ছে করে না। তার সেই ঘরটির মধ্যে গত রাত্রের আরেক সত্তা যেন অপেক্ষা করে আছে তাকে অসংখ্য প্রশ্নে ক্ষতবিক্ষত করবার জন্যে।

অনেক রাত, সারারাত যদি সে এই শহরের নির্জন পথে পথে একা একা ঘুরে বেড়াতে পারত, একদিন যেমন বেড়িয়েছিল।

কিন্তু সেদিন সে একা ছিল না।

সে কি তারই নিজের কাহিনী?

সাত

নীরজা দেবী চিঠিটা পড়লেন। একবার নয় অনেকবার।

তারপর চশমাটা খুলে রেখে ভ্রুকুঞ্চিত করে কঠিন মুখে সামনের দেয়ালে টাঙান ছবিটার দিকেই চেয়ে রইলেন কিছুক্ষণ। ছবিটা কমলদ'র বড় তরফের পরলোকগত রাজশেখর চৌধুরীর পূর্ণাবয়ব তৈলচিত্র। কিন্তু নীরজা দেবী তাঁর স্বর্গীয় স্বামীর ছবি দেখতে তন্ময় বা তার অতি প্রকট খুঁতগুলি লক্ষ্য করে বিরক্ত বোধহয় নয়। ছবিটা তাঁর চোখে ছায়া ফেললেও মনে তার কোন ছাপ তখন নেই।

নীরজা দেবী সমস্ত শক্তি দিয়ে নিজেকে সংবরণ করবার চেষ্টা করছেন। তাঁর প্রকৃতিতে বারুদের মশলা আছে তিনি ভালো করেই জানেন, এক মুহূর্তে দপ করে তিনি জ্বলে ওঠেন। তাঁর মনের আকস্মিক দুর্বার বেগ কোন শাসন তখন মানে না। জীবনে এই উদ্দামতা আর জেদের জন্যে অনেক খেসারত তাঁকে দিতে হয়েছে। যৌবনে সে মূল্য দিয়েও নিজেকে শাসন করবার প্রয়োজন তিনি স্বীকার করেননি। কিন্তু তখন যা করেছেন এখন আর তা করা যায় না। নিজের জন্যে এবং তার চেয়ে বেশী মলয়ার জন্যে তাঁকে হিসেব করতে বসতে হয় নিজেকে সংযত করে।

চিঠিটা পড়ে তিনি রাগে কেঁপে উঠেছিলেন। আগুন জ্বলে উঠেছিল মাথার মধ্যে। এ চিঠির মোলায়েম ভাষার মধ্যে কি সর্পিল উদ্দেশ্য যে লুকোন তা তাঁর বুঝতে দেরী হয়নি। প্রচ্ছন্ন চাপ দিয়ে তাঁকে যতদূর সম্ভব নিংড়ে নেওয়া। নেপথ্যে খড়্গটা ঝুলিয়ে রেখে অঙ্গুলি হেলনে তাঁকে ওঠানো বসানো।

প্রথম মুহূর্তে ইচ্ছে হয়েছিল তৎক্ষণাৎ গাড়ি নিয়ে গিয়ে সেই নীচ কীটানুকীটটাকে উচিত শিক্ষা কিছু দিয়ে আসতে।

তারপর ইচ্ছে হয়েছিল চিঠিটা টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ব্যাপারটাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করতে।

কিন্তু দুটোর কোনটাই তিনি করলেন না। নিজেকে সংযত করে স্থিরভাবে ভেবে দেখে বুঝলেন উত্তেজিত অস্থির হলে এখানে চলবে না।

শিক্ষাই যদি বিপিন ঘোষকে দিতে হয় তাহলে অনেক দিক বিচার করে সাবধানে অগ্রসর হতে হবে।

বিপিন ঘোষকে তার উদ্দেশ্য বুঝতে দেওয়াই চলবে না। সে নিশ্চিন্ত নিরাপদ নিজেকে মনে করুক, আশান্বিত হোক সাফল্য সম্বন্ধে।

বিপিন ঘোষ কী পেয়েছে? কোন অস্ত্রের জোরে তার এত সাহস?

নীরজা দেবী মনে করবার চেষ্টা করলেন।

সব মনে করা শক্ত। পরিণাম ভেবে আটঘাট বেঁধে তো কিছু করেননি। তা তাঁর স্বভাবেই নেই। তা ছাড়া করবেনই বা কেন? আর যার কাছেই হোক উমাপতি ঘোষালের সঙ্গে হিসেব করে ব্যবহার করার কোন প্রশ্নই আসেনি।

চেষ্টা করলেই কি হিসেব করতে পারতেন! সে কি দুর্বার স্রোতের সব দিন! জীবনে প্রথম যেন ঝাঁপ দিয়ে পড়বার মত কিছু পেয়েছিলেন। একটা আশ্চর্য জোয়ার নিজের মধ্যে।

অগ্রপশ্চাৎ না ভেবে নিজের মনের খেয়ালে এমন ঝাঁপ দিয়ে আগেও কতবার পড়েছেন। কিন্তু তার সঙ্গে এ আত্মনিমজ্জনের অনেক তফাৎ।

আত্মনিমজ্জন তো নয়, এ আত্মোৎসর্গ।

তেমনি একটা পবিত্র অনুভূতিই তাঁর মনের মধ্যে পেয়েছেন।

উমাপতির সব কথা ভালো করে বোঝেননি। শুধু স্থির একটা প্রত্যয় জেগেছে যে, এক আশ্চর্য রূপান্তর ঘটাবার জন্যে তার অসাধ্য

সাধনা। রূপান্তর তার নিজের সত্তারই, সেই সঙ্গে তার পরিধির মধ্যে যারা আছে তারা যদি সংক্রামিত হয়।

বাতুলের হাস্যকর চেষ্টা।

এ সমালোচনা শোনেননি এমন নয়। কিন্তু নিজের মনে কোন সংশয় কোনদিন জাগেনি। বরং এই কথাই ভেবেছেন যে সব আশ্চর্য অমানুষিক সাধনা তো বাতুলেরাই করতে অগ্রসর হয়। ইতিহাসের পথ তাদেরই ব্যর্থ কঙ্কাল দিয়ে বাঁধানো।

তারপর কোথা থেকে কি হয়ে গেল।

সে পবিত্র অনুভূতি কি হারিয়ে গেল?

না, তাও তো নয়।

কিন্তু তার চেয়ে প্রবল হয়ে উঠল আর কিছু। তা যে কি নিজের কাছেও স্বীকার তখনও করেননি। এখনও করতে চান না।

স্বীকার না করবার জন্যে, নিজেকে স্পষ্ট করে না দেখতে চাওয়ার জন্যেই ওই বিদ্রোহ।

বিদ্রোহ তো নয়, বিষোদ্গার। সে তাঁর নিজেরই মনের অতলের বিষ বলে তখন কিন্তু সত্যিই বোঝেননি।

এখন অবশ্য মাঝে মাঝে আত্মবিচারের একটা বেগ আসে। একটা কিসের যন্ত্রণা।

সেই যন্ত্রণাই সেদিন উমাপতির স্মৃতিসভায় তাঁকে টেনে নিয়ে গেছল। হঠাৎ চলে গিয়েছিলেন। স্মৃতিসভার ভীড় বাড়াতে নয়। কিসের একটা অদম্য আকর্ষণে।

না গেলেই ভালো করতেন। ওই খবরের কাগজের সেই ছোকরা তাহলে সঙ্গে আসার আর সুযোগ পেত না, আর মলয়ার সঙ্গে ওই দৃশ্যের সূচনাটুকুও দেখে যেতে পারত না।

কী অস্বস্তিই না হয়েছিল। যেন নিভৃতের বিস্রস্ত বেশবাস হঠাৎ ক্ষণিকের জন্যে অন্যের দৃশ্যগোচর হয়ে গেছে। দেহের নয়, মনের আবরণের বিস্রস্ততা।

ব্যাপারটাকে অগ্রাহ্য অবগু কবা যায়। তাই করবার চেষ্টা করেছেন। কী ভাবতে পারে ওই ছোকরা? মা ও মেয়ের মধ্যে ঠিক মধুব সম্পর্ক নয়? মার সম্মান রাখতে মেয়ে জানে না। এত বড পরিবারের মেয়ে উদ্ধত উগ্র ছুর্বিনীত?

তাই যদি ভাবে তো ভাবুক।

কিন্তু ওই ভেবে অগ্রাহ্য করবার চেষ্টা করেও মনের অস্বস্তিটা যায় না কেন?

অস্বস্তির মূল আরো গভীর কোথাও বলে?

সত্যিই তার কারণ একটা আছে অস্বীকার কবতে পারেন না বলে?

মলয়া সেদিন ড্রইংরুমে অপবিচিত একজনের সামনেই অমন অসংযত হয়ে উঠবে কল্পনা করতেই পারেননি। পারলে নিশ্চয় ওই খবরের কাগজের ছোকরা—কি নাম—হ্যাঁ রাহা, রাহাকে বাড়ি পর্যন্ত নিয়ে আসতেন না।

কিন্তু তাকে সঙ্গে আসবার অনুমতিই দিয়েছিলেন কেন?

সেইটেই ছুর্বোধ।

কিছু কি সত্যি তাকে বলতে চেয়েছিলেন?

না তা চাননি, কিন্তু মনের অগোচরে কোথায় যেন অস্পষ্ট একটা বাসনা ছিল,—কেউ তাঁকে প্রশ্ন করুক এই বাসনা। প্রশ্নে তাঁকে জর্জরিত করে তুলুক এমনও বুঝি অর্থহীন একটা অভিলাষ।

নিজেকে নিজে প্রশ্ন করতে সাহস নেই বলেই কি এই যন্ত্রণা-বিলাসের আগ্রহ?

মলয়ার সঙ্গে বোঝাপড়া এখনও হয়নি।

মলয়ার অভিযোগের উত্তরও দিতে পারেননি কিছু।

রাহা চলে যাবার পর মলয়া আরো উগ্র নির্মম হয়ে উঠেছিল,—তুমি কোন মুখে ওই সভায় গিয়েছিলে! তোমার বিচার-বিবেচনা নেই, কোনকালে ছিল না, কিন্তু লজ্জা বলেও কি কিছু নেই। কাল

খবরের কাগজে খবর বেরুবে। উমাপতি ঘোষালের স্মৃতিসভায় যাঁরা উপস্থিত ছিলেন তাঁদের মধ্যে ফলাও করে নীরজা দেবীর নাম। কমলদা'র বড় তরফের সেই স্বনামধন্যা নীরজা চৌধুরীর।

নীরজা দেবী কিছুই বলতে পারেননি।

মলয়া জ্বালাময় দৃষ্টিতে তাঁর দিকে একবার তাকিয়ে যেমন এসেছিল তেমনি ঝড়ের মতই ঘর থেকে বার হয়ে গেছল।

পরের দিন খবরের কাগজে অবশ্য কোথাও তাঁর নাম দেখেননি।

অসীম রাহার বিবরণেও তাঁর উল্লেখ নেই।

অসীম রাহার এটা কি অনুগ্রহ না অবজ্ঞা?

খবরের কাগজে নাম না থাকলেও সমস্ত মন তাঁর সেই থেকে অস্থির হয়ে আছে।

মলয়ার সেই প্রায় হিংস্র মাত্রাছাড়ানো ভর্ৎসনায় তিনি আহত অবশ্যই হয়েছেন, কিন্তু তার চেয়ে বেশী উদ্বিগ্ন।

উদ্বিগ্ন মলয়ারই জন্যে। তার মনের কোথায় একটা ক্ষতের দাগ যেন কিছুতেই মিলিয়ে যাচ্ছে না।

এখনও তার পেছনের চেয়ে সামনের জীবনই অনেক বেশী প্রসারিত ও সম্ভাবনাময়। যে কোন ক্ষত তো তার অনায়াসে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়ার কথা।

কিন্তু সত্যিই নিশ্চিহ্ন হয়ে গেলে কারণে অকারণে এই আকস্মিক বিস্ফোরণ কি দেখা দিত! এই উদ্ধত উচ্ছৃঙ্খলতা!

হ্যাঁ উচ্ছৃঙ্খলতাই। নিজের কাছে গোপন করে লাভ নেই যে মলয়ার প্রাত্যহিক জীবন শোভনতা শালীনতার সীমা ছাড়িয়ে উগ্র উত্তেজনার পথই বেছে নিচ্ছে।

সবচেয়ে মর্মান্তিক এই যে নিজের মনে অস্পষ্ট এক অনুশোচনায় দগ্ধ হওয়া ছাড়া তাঁর করবার কিছু নেই। তিনি পঙ্গু নিরুপায়। নিজের কন্যার ওপর সমস্ত স্নেহের অধিকারও তাঁর যেন বাজেয়াপ্ত হয়ে গেছে অনুচ্চারিত কোন অভিযোগে।

শাসন করবার, বাধা দেবার অধিকার তাঁর নেই, তবু নির্লিপ্ত হয়েও তিনি থাকতে পারবেন না। অন্তত মলয়ার জীবনে তাঁর অবিবেচনার ফলে কোন আঘাত যাতে গিয়ে না পৌঁছোয় তার জন্যে সর্বস্ব পণ করেও তাঁকে যুঝতে হবে।

সেই জন্যেই বিপিন ঘোষ সম্বন্ধে এত সাবধান হওয়ার প্রয়োজন।

বিপিন ঘোষ কোন অস্ত্রকে প্রধান মনে করেছে তা তিনি জানেন না। হয়ত সেও আশাতিরিক্ত কিছুর স্বপ্ন দেখেছে। হয়ত এমন কিছুই সে পায়নি যা তাঁর পক্ষে গ্লানির কারণ হয়ে উঠতে পারে। শুধু তাঁর প্রতিক্রিয়া কি হয় তা বোঝবার জন্যে সে প্রচ্ছন্ন একটু হুমকি দিয়ে দেখছে।

প্রতিক্রিয়া যে কি তা বিপিনকে বুঝতে তিনি দেবেন না।

কিন্তু তাকে একটু উৎসাহিত হবার মত একটু আস্কারাও দেবেন। তার জন্যে বিপিন ঘোষের সঙ্গে ফোনে একটু কথা বললেই বা ক্ষতি কি? একটু বিস্মিত বিমূঢ়ভাবে আলাপ করা!—আপনার চিঠি পেলাম। ভালো বুঝতে পারলাম না আপনার বক্তব্যটা। একদিন আসুন না। হ্যাঁ, বিকেলে চা খেতেও তো আসতে পারেন আপনার অফিসের পরে!

বিপিন কোন একটা অফিসে কাজ করে তিনি জানেন। নামটা এখন মনে পড়ছে না। কিন্তু তাঁর পুরনো ডায়েরীতে লেখা আছে মনে হচ্ছে।

নীরজা দেবী পুরনো ডায়েরীটা খুঁজতে ওঠেন। ডায়েরীটা তিনি হারাননি, আর বিপিন ঘোষও আশা করা যায় তার সেই চাকরিতে এখনও বহাল আছে।

ফোন অফিসেই করতে হবে, কারণ বিপিন কোথায় থাকে যদিও তিনি জানেন, সেখানে কোন ফোন নেই।

আট

অসীম তার হাতঘড়িটা দেখল। সাতটা বাজতে দশ মিনিট। আরো মিনিট দশেক সে অপেক্ষা করবে। তারপর আর অপেক্ষা করে লাভ নেই। খবর তার ভুল হতে পারে না। এখানে আসাটা অনিশ্চিত হতে পারে কিন্তু এলে সাতটার আগেই আসবে।

এলে তার নজর এড়িয়ে যাওয়ারও সম্ভাবনা নেই। মোটরটাই তাকে চিনিয়ে দেবে। শহরের যে কোন জায়গায় মোটরের. মেলা থেকে সেটাকে আলাদা করে নেওয়া যায়।

এখানে অবশ্য মোটরেরই মেলা। পার্ক করবার আর জায়গা নেই বললেই হয়। এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত সে বার কয়েক টহল দিয়ে এসেছে সমস্ত গাড়িগুলোই ভালো করে লক্ষ্য করে।

না, সে গাড়ি এই সারি সারি অপেক্ষা করা মোটরের মেলার মধ্যে নেই।

ওপারের বিখ্যাত হোটেলটার সামনে সজাগ দৃষ্টি রেখে অসীম তাই এপারের ট্রাম স্টপটার কাছে পায়চারি করছে।

কেউ লক্ষ্য করলে কৌতূহলী হত নিশ্চয়।

ট্রামের পর ট্রাম আসছে যাচ্ছে। ভীড় তাতে যথেষ্ট। কিন্তু তবু না ওঠা যায় এমন নয়। কিন্তু কোন ট্রামই যেন তার মনঃপূত নয়।

যে কোন মুহূর্তে বৃষ্টি আসবার ভয় না থাকলে এই জায়গাটার একটা আকর্ষণ আছে সন্দেহ নেই।

রাস্তার একদিকে শহরের উৎসব-বেশ। বড় হোটেলের সামনের প্রশস্ত ফুটপাথটা একটা উজ্জ্বল নিমন্ত্রণ। দোতালার লম্বা স্নিগ্ধ আলোকিত বারান্দাটা অর্ধস্ফুট উত্তেজনায় ইঙ্গিতময়। ক্ষণে ক্ষণে রং পাল্টানো নিয়ন-লিপিগুলো নগরের নির্লজ্জ কটাক্ষ।

আর এপারে আলোর ঝাপসা ছিটে ছড়ানো দীঘিটার কালো জল ছাড়িয়ে বহু দূরের প্রশস্ত রাস্তার স্থির ও দ্রুত ধাবমান বর্তিকা-বিন্দুতে আরো গাঢ়-করে-তোলা একাকার আকাশ ও প্রান্তরের অন্ধকার অসীম রাত্রি-নিবিড়তা।

এখানে দাঁড়িয়ে থাকলে দিনের সেই লক্ষ সংঘাত সংঘর্ষ আশা-নিরাশা উল্লাস যন্ত্রণার ঘূর্ণিপাকের নগরে আছি বলে মনে হয় না। মনে হয় প্রতি রাত্রে এ নগরও যেন কোন আশ্চর্য অভিসারে বার হয়।

একদিন এই বিচিত্র রহস্য-নগরীর গীতিকাব্যের কবি হবে এই ছিল অসীম রাহার সাধ। সে সাধের চূর্ণ সব কণা তার ঊর্ধ্বশ্বাস সাফল্য-সন্ধানেব পথে কোথায় পিছনে ছড়িয়ে আছে। তার অদম্য সঙ্কল্পের রথ এখন অন্য এক সিদ্ধির লক্ষ্য নিয়ে ধাবমান ; যে সিদ্ধি সুলভ খ্যাতির, নিশ্চিন্ত প্রাচুর্যের।

মনের মধ্যে কোথায় একটা অব্যক্ত ভর্ৎসনা কি এখনও অনুভব করে ? করলেও তাকে প্রশ্রয় দিতে অসীম রাজী নয়।

সাফল্য বলতে সবাই যা বোঝে তাই সে উপাস্য করেছে। দেবতার বদলে হয়ত অপদেবতা। কিন্তু তাব নিজেব নিষ্ঠায় কোন দ্বিধার দোলা সে রাখবে না। বেখে কোন লাভও নেই আর। ফিরে যাবার পথ তার রুদ্ধ।

এই নগরের রহস্য বিস্ময়কে ছন্দে তুলিয়ে চিরন্তন করাব সাধনা তার জন্যে নয়, তার বদলে সে খবরের কাগজের পাতায় উত্তেজনার ঢেউ তুলবে দুদণ্ডের জন্যে। পাঠকেরা অসুস্থ আগ্রহের যে চমকপ্রদ বিবরণ পড়ে পবের দিন ভুলে যায় তারই নতুন নতুন ঝাঁঝালো উপাদান সংগ্রহ ও সাজানো তার কাজ।

অসীম রাস্তার ধারে এসে দাঁড়াল পার হবার জন্যে। ওপারে হোটেলের ধারে সেই মোটরটাই এতক্ষণে এসে দাঁড়িয়েছে।

হলদে আলোটা নিভে লাল হতে না হতেই সে দ্রুত পায়ে ওপারে গিয়ে পৌছোল।

গাড়ির আরোহীরা ততক্ষণে হোটেলের সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে গেছে। তাতে কিছু আসে যায় না। যেখানেই তারা বসুক অসীমের খুঁজে নিতে অসুবিধে হবে না। তা ছাড়া বসবার একটি নির্দিষ্ট জায়গাই তাদের আছে এ খবরও তার জানা।

অসীম হোটেলের সিঁড়ি দিয়ে উঠল। উঠবার পথে দরোয়ান তাকে সেলাম করেছে। আজ তার সেলাম করবার মতই পোশাক। বড় হোটেলের দরোয়ানেরা চেনা হলে হয়ত মুখের দিকে চায়। নইলে তারা পোশাকই দেখে। পোশাক তারা বোঝে।

এ হোটেল অবশ্য তার একেবারে অচেনা নয়। মাঝে মাঝে তাকে অন্য কাজেও এখানে আসতে হয়েছে।

চেনা বয়ও একজন মিলল। অসীম তখন বারান্দায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে। এখানে একটি ছোট টেবিল বেছে নিলে।

না, ওদের খুব কাছে নয়। ওদের টেবিল একেবারে বারান্দার রেলিংএর ধারে। অসীমের অন্য প্রান্তে। মাঝখানে আরো একটা-দুটো টেবিলের ব্যবধান আছে। কিন্তু দৃষ্টির আড়াল নেই।

এখনও অত্যন্ত সংযত শালীন পরিবেশ।

রাত সবে শুরু।

পরে এই পরিচ্ছন্ন শান্তি হয়ত থাকবে না। কিন্তু অসীম তার আগেই উঠে যাবে। উদ্দাম হয়ে ওঠা পর্যন্ত চালিয়ে যাবার তার প্রবৃত্তিও নেই, সঙ্গতিও নয়।

তাকে সবই লোক দেখানো করতে হবে, কিন্তু হিসেব করে।

রামবাবুর কাছেই উদ্দেশ্যটা বলার পর রসদ পেয়েছে এ নৈশ অভিযানের। পেয়ে একটু বিস্মিত যে হয়নি তা নয়। রামবাবু কি কাগজের তহবিল থেকে দিয়েছেন? তা তো সম্ভব বলে মনে হয় না। তাহলে রামবাবুর এ বদান্যতার অর্থ কি। কী তাঁর এতে স্বার্থ?

এটাও একটা রহস্য।

আজ তার বিশেষ কিছু করবার নেই। শুধু তার উপস্থিতিটা যদি একটু গোচর করে রাখতে পারে তাহলেই যথেষ্ট।

আজ শুধু ভূমিকা। পরবর্তী অধ্যায়ের জন্যে ধৈর্য ধরা।

কিন্তু মজুরী পোষাবার মত পরবর্তী অধ্যায় কি কিছু পাবে? দেখাই যাক।

ভাগ্য তার একটু সুপ্রসন্ন। সুবেশ সুপুরুষ এক ভদ্রলোক এদিকের বারান্দায় এসে বসবার জায়গা খুঁজছেন। অসীম তাঁকে চেনে। কিন্তু নিজে থেকে দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করলে না শোভনতার খাতিরে।

ভদ্রলোকই তাকে দেখতে পেয়ে তারই টেবিলের একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বললেন—আপত্তি নেই আশা করি।

আপত্তি? বরং এ তো আমার সৌভাগ্য।—যথোচিত লৌকিকতা বিনিময় করে অসীম হাসল।

বয় কাছে এসে দাঁড়িয়েছে।

অসীম ভদ্রতা করে বললে,—বলুন কি দেবে?

বলছি!—ভদ্রলোক হাসলেন,—কিন্তু টেবিলটা আমার মনে রাখবেন।

অসীম এইটেই আশা করেছিল। তবু প্রতিবাদের ভান করলে,—তা কখনো হয়! টেবিলটা আমারই। আপনি অতিথি।

হ্যাঁ অতিথি। কিন্তু যেহেতু অনাহুত তাই সাধারণ নিয়মটা উল্টে যাবে। এ টেবিল ছেড়ে উঠে যাই তা নিশ্চয় চান না!

মোটেই না।—অসীমকে হেসে জানাতে হল।

তাহলে সুবোধ বালকের মত যা বলছি মেনে নেবেন।—ভদ্রলোক সমস্যাটা এক কথায় মিটিয়ে দিয়ে বয়কে তাঁর ফরমাশ জানালেন। জানালেন দুজনের জন্যেই।

এটা কি ভালো হল মিঃ পাল?—অসীম মৃদু অনুযোগ জানালে নাম ধরে।

• এতক্ষণে নামটা তার মনে পড়েছে। মুখটা যদিও চেনা, এবং কোথায় কি সূত্রে দেখা হয়েছে তাও আগেই স্মরণ করতে পেরেছে, তবু নামটা সম্বন্ধে কিছুতেই এতক্ষণ স্থির নিশ্চয় হতে পারছিল না। তার জন্যে একটু অস্বস্তিও বোধ করছিল।

পাল অসীমের অনুযোগ অগ্রাহ্য করে বললেন,—তারপর! আপনাকে তো এসব জগতে বড় একটা দেখি না। এখানে তো পানীয়ের গুণে কখনো-সখনো কারুর পদস্খলনের বেশী বড় ঘটনা কিছু ঘটে না! অপোগণ্ড অকালকুষ্মাণ্ড ও পাষণ্ডদের অর্থ ও স্বাস্থ্য নাশই এখানকার একমাত্র খবর। সে খবরে আপনার কলম উঠবে কি?

পালের মাপ অসীম ইতিমধ্যেই বুঝে নিয়েছে। মনেও পড়েছে আগেকার অভিজ্ঞতা থেকে।

পৈত্রিক বেশ কিছু আছে। তার জোরে বড় একটা বিদেশী যন্ত্রপাতি আমদানির কারবারের প্রধান অংশীদার। এসব কারবারের কিছু ভেতরের খবর নেবার জন্যে কিছুদিন যোগাযোগ করতে হয়েছিল। নিজেকে কেওকেটা বলে মনে করেন। বাকচাতুর্যেরও একটা অভিমান আছে। সুতরাং এ রকম দু'চারটে বাছা বাছা সরস বুলি শুনতে হবে মাঝে মাঝে।

তা হোক। একেই কাজে লাগাতে হবে।

অসীম বেশ সরবে হেসে পালের বাকচাতুর্যের মর্যাদা দিলে, তারপর বললে,—কলমের কালি হাতের বদলে মনেও মাঝে মাঝে লাগে তা জানেন! সেই কালি ধুতেই কখনো-সখনো আসতে হয়।

চমৎকার! চমৎকার!—পাল তারিফ করলেন,—খুব খাঁটি কথা বলেছেন। মনের কালি ধোয়ার আশাতেই এখানে আসা, সে কালি কলম থেকেই লাগুক কিংবা আর কিছু থেকে।

বয় এসে তখন টেবিলে পানীয় রেখে গেছে।

অসীম ওদিকের টেবিলের দিকে যেন হঠাৎ দৃষ্টি পড়ায় একটু

বিস্মিতভাবে বললে,—আচ্ছা ওদিকের টেবিলের ওই মেয়েটি মানে ভদ্রমহিলাকে যেন চেনা চেনা লাগছে! ·

পাল তখন তাঁর পাত্রে এক চুমুক দিয়েছেন। পাত্রটা টেবিলে আবার নামিয়ে রেখে বললেন,—অমার্জনীয়! অমার্জনীয়!

অসীম বিমূঢ়তার ভান করলে,—অপরাধটা বুঝতে পারলাম না।

পারলেন না? আপনি চেনা চেনা লাগছে বললেন, তাও ঝানু সাংবাদিক হয়ে। মিস মলি চৌধুরী আপনার কাছে শুধু চেনা চেনা! পূর্ণিমার চাঁদ দেখেও তো আপনি বলবেন তাহলে, কোথায় যেন দেখেছি মনে হচ্ছে!

পাল নিজেই হেসে টেবিল মাত করলেন।

অপ্রত্যাশিতভাবে তাতেও এমন কাজ হবে কে জানত!

আজ অসীম বাহার বৃহস্পতি তুঙ্গী।

ওদিকের টেবিল থেকে মলি চৌধুরীই ভ্রুকুটি করে তাদের দিকে তাকাল। সঙ্গী দুজনকে চাপা গলায় কি যেন বলছেও মনে হল।

মিস চৌধুরী কিন্তু আপনাকেই লক্ষ্য করছেন মিঃ পাল!—অসীম উদ্বিগ্ন হবার ভান করে জানালে,—আপনার হাসি নিয়েই কি যেন বলছেন মনে হচ্ছে।

হাসিটার হেতু জানলে কি বলেন তাহলে দেখা যাক!—হাসতে হাসতেই পাত্রটা তুলে নিয়ে এক চুমুকে নিঃশেষ করে পাল সত্যিই উঠে পড়লেন।

অসীম একটু সন্ত্রস্ত হয়নি এমন নয়। ঠিক এইভাবে যোগাযোগটা সে চায়নি। তবু এখন বাধা দেওয়ার চেষ্টা বৃথা।

পাল ও টেবিলের দলের সঙ্গে বেশ ভালোভাবেই পরিচিত বোঝা যাচ্ছে। হাসতে হাসতে যা বলছেন তারও কয়েকটা কথা কানে আসছে,—তাহলে হাসিটা মাপ করেছেন···ভদ্রলোককে বড় অপ্রস্তুত করেছি···অনুমতি তাহলে দিচ্ছেন···পৃথিবীতে অজ্ঞানতার অন্ধকার দূর করাই আমার ব্রত।

তারপর আবার হাসি।

বয়দের সে টেবিলে আরো দুটো চেয়ার লাগাবার ব্যস্ততা আর পালের হাসতে হাসতে তার দিকে আসা দেখেই অসীম ব্যাপারটা তখন অনুমান করে ফেলেছে। পাল এসে দাঁড়াতেই কিন্তু যথোচিত কুণ্ঠিত হবার ভান করে বললে,—আচ্ছা আমাকে এভাবে অপ্রস্তুত করা কি আপনার ভালো হল!

অপ্রস্তুত যদি হয়ে থাকেন তাহলে এবার প্রস্তুত হ'ন।—পাল ভাষার প্যাঁচ দেখাবার এ সুযোগ ছাড়লেন না,—স্বয়ং মলি চৌধুরী আপনার সঙ্গে আলাপ করতে উৎসুক।

আমার পরিচয় কিছু দিয়েছেন না কি?—অসীমের উদ্বেগটা এবার আন্তরিক।

এখনো দেবার সুযোগ হয়নি।

তাহলে অনুগ্রহ করে আর দেবেন না। শুধু আপনার পরিচিত এইটুকু গৌরবই আমার যথেষ্ট হবে!

তথাস্তু।—বলে পাল অভয় দিলেন।

অভ্যর্থনাটা ভদ্রতাসঙ্গতই হল। পাল পরিচয় করিয়ে দিলেন। মলি চৌধুরী নামটা উচ্চারণ করে একটু থামলেন। সবাই হাসল।

মলি চৌধুরীর মুখেও কি একটু প্রসন্ন কৌতুকের আভাস?

ঠিক বোঝা গেল না।

মলি চৌধুরীর সঙ্গী দুজনেরও পরিচয় পাওয়া গেল। একজন কি যেন ভট্টাচার্য। বিখ্যাত সদাগরী জাহাজ কোম্পানীর বড় অফিসার। ক'দিনের জন্যে কলকাতার বন্দরে এসেছে, আর একজন শুধু একটা নাম। হিমাদ্রিনারায়ণ ভঞ্জরায়ই যেন শুনল। নামের পেছনে এমন ইতিহাস বা ঐশ্বর্য নিশ্চয় আছে যাতে নামটাই তার যথেষ্ট পরিচয় বলে মনে হল।

নমস্কার বিনিময় করে পালের সঙ্গে অসীমও আসন নিয়ে বসল। তারপর যতদূর সম্ভব অনুগৃহীত ভাব করে বললে,—দেখুন, আমার

অজ্ঞতার জন্যে লজ্জিত হওয়াই আমাব উচিত। কিন্তু তা ঠিক হতে পারছি না। এই অজ্ঞতার দরুণই তো আপনাদের, বিশেষ করে আপনার সঙ্গে পরিচয়ের সৌভাগ্য হল।

কথাগুলো মলি চৌধুরীর দিকে দৃষ্টি রেখেই বলা।

মলি চৌধুরী সত্যিই এবার হাসল। হাসিটা মধুবই বলা উচিত। সে রাত্রের মলি চৌধুরীর মুখে অন্তত এ হাসি কল্পনা করা যেত না।

মলি চৌধুরী হেসে বললে,—আশা করি সৌভাগ্য হিসেবেই এটা মনে রাখবেন!

কথাটা কেমন অর্থহীন নয় কি? শুনে অন্তত একটু অবাক হতে হয়।

অবাক হতে হল মলি চৌধুরীর পবের ব্যবহারেও। আসর তখন সবে জমতে শুরু করেছে। পানীয়ের গুণে মনপ্রাণ না হোক, সবার মুখ খুলছে। মলি চৌধুরী হঠাৎ টেবিল থেকে উঠে পড়ে বললে,—আমি অত্যন্ত দুঃখিত। কিন্তু আমায় এখন যাবার অনুমতি দিতে হবে।

সবাই বিস্মিত প্রতিবাদে মুখর হয়ে উঠল। বিশেষ করে ভঞ্জরায়।

কিন্তু মলি চৌধুরী অটল,—অবুঝ হোয়ো না হিমাদ্রি। অন্যায় অনুরোধ কোরো না। তোমরা চালাও।

সকলকে বিমূঢ় করে টেবিল ছেড়ে চলে যেতে গিয়ে মলি আবার ফিরে দাঁড়াল,—আপনিও আসুন না মিঃ রাহা। এ আসরে আপনার খুব উৎসাহ আছে বলে তো মনে হয় না।

কথাটা এমন অপ্রত্যাশিত, অবিশ্বাস্য যে অসীমের মনে হল শুনতেই বোধহয় তার ভুল হয়েছে কিছু। অন্যেরাও তখন স্তম্ভিত নির্বাক।

কই আসুন।—এবারে অনুরোধ নয়, আদেশই।

অসীম নীরবে উঠে দাঁড়িয়ে মলি চৌধুরীকে অনুসরণ করলে। অন্যদের কাছে ভদ্রতার খাতিরে বিদায় নেওয়াটাও তার হল না।

সিঁড়ি দিয়ে নেমে হোটেলের সামনের ফুটপাথে। সেখানে বেশীক্ষণ অপেক্ষা করতে হল না।

মলি চৌধুরীকে দেখেই দরোয়ান ব্যস্ত হয়ে উঠল। ওপার থেকে ড্রাইভারেরও গাড়ি নিয়ে আসতে দেরী হল না।

এবার মলি চৌধুরী যা করে বসল তাও বিমূঢ় করবার মত।

ড্রাইভারকে হঠাৎ ছুটি দিয়ে নিজেই চালকের আসনে গিয়ে বসল। অসীমের দিকে ফিরে বললে, 'আসুন'।

এটা খাস মার্কিন গাড়ি। বাঁ দিকে ড্রাইভারের বসবার জায়গা। অসীমকে তাই ঘুরে ওদিকে গিয়ে উঠতে হল।

এই ঘুরে যাওয়াটাও বুঝি তাৎপর্যময়। গাড়িটার বিশেষত্বের দরুণ নয়, ঘুরে যেতে বাধ্য হওয়া যেন মলি চৌধুরীরই অভিপ্রায়ে।

এইটুকুর ভেতরেই তার সূক্ষ্ম ও প্রচ্ছন্ন একটা অবজ্ঞামিশ্রিত অনুগ্রহের ইঙ্গিত।

ঘুরে গিয়ে বসাটা অসীমের কিন্তু সম্পূর্ণ বিপরীত দিক দিয়ে কাজে লাগে। আত্মস্থ অবিচলিত নিজেকে মনে করার যত গবই থাক, মলি চৌধুরীর খানিক আগের আকস্মিক ব্যবহারে সে একটু বিহ্বলই হয়ে পড়েছিল সন্দেহ নেই। এই ঘুরে গিয়ে বসবার মধ্যেই নিজেকে সামলে নিয়ে তার ভারসাম্য ফিরে পাবার সে সময় পায়। মলি চৌধুরীর যে কোন খেয়ালকে সকৌতুক নির্লিপ্ততার সঙ্গে নেবার জন্যে সে এখন প্রস্তুত।

কিন্তু তার আত্মবিশ্বাসে আরো একটা নাড়া খাওয়া যে বাকি সে আর কি করে জানবে।

মলি চৌধুরী নিপুণ হাতে সবেগে গাড়িটা চালিয়ে রাস্তার ট্রাফিক লাইটগুলোর শাসন পলকের ভগ্নাংশে যেন অবজ্ঞাভরে ব্যর্থ করে দিয়ে সোজা গঙ্গার ধারের একটি নির্জন জায়গায় এসে ইচ্ছে করেই যেন একটা ঝাঁকানি দিয়ে হঠাৎ থামালে।

ইঞ্জিনটা বন্ধ করে দিয়ে তারপর পেছনে হেলান দিয়ে নিজেকে

এলিয়ে দেবার ভঙ্গিতে বললে,—জায়গাটা কেমন ? নির্জন নয় কি ?

অসীমও তখন প্রস্তুত। বললে,—নির্জন কিন্তু নিরাপদ নয় !

কেন ? গুণ্ডারা হানা দিতে পারে ?

তা' তো পারেই। গুণ্ডাদের শাসন করা যাঁদের কাজ তাঁরাও নীতিধর্মের ধারক হয়ে কখনো কখনো অনুগ্রহের দৃষ্টি দেন শুনেছি।

শুধু শুনেছেন ! একবার না হয় প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা হবে।—মলি চৌধুরী হঠাৎ সোজা হয়ে উঠে বসে অসীমের দিকে ফিরে বললে,—শিকারের পেছনে লুকিয়ে ধাওয়া করছিলেন। শিকার নিজেই আপনার সামনে এসে ধরা দিয়েছে। এবারে কি বাণ ছাড়বেন ছাড়ুন।

কথাগুলো এখনও কিছুটা পরিহাসের সুরে বলা। সুতরাং এখনও লুকোচুরির খেলা করা চলে।

অসীমও লঘুস্বরে বললে,—আপনাকে শিকার করবার স্পর্ধা আমার হবে একথা ভাবতে পারলেন কি করে ? আমার তো ছেলেখেলার তীরধনুক সম্বল। তা দিয়ে বড় জোর চড়ুই শালিককে তাগ করা যায়। বনের হরিণী আমার স্বপ্নেরও বাইরে।

আপনার বিনয় উপভোগ করলাম। কিন্তু আমারই একটু বলার ভুল হয়েছে। শিকার যে আমি নই তা আমিও জানি আপনিও জানেন। আমায় দিয়ে শুধু আসল উদ্দেশ্য সিদ্ধি করতে চান। তাই করবার সুযোগই আপনাকে দিতে এলাম।

গলার স্বরটা এখন একটু কঠিন হয়েছে। অসীম নিজেকে প্রস্তুত করবার জন্যে আর একটু সময় নিলে কথাটা অন্য দিকে ঘুরিয়ে,—আপনি আমার কি পরিচয় জানেন, আমি ঠিক জানি না···

আপনার সঠিক পরিচয়ই জানি।—মলি চৌধুরী বাধা দিলে। —আপনার কাছে আমি চেনা চেনা হতে পারি, কিন্তু আপনাকে আমি ভালো করেই চিনি। তা ছাড়া আমার স্মৃতিশক্তিটা দুর্বল ভাবছেন কেন ?

অসীম আবার হাল্কা হবার চেষ্টা করলে। একটু হেসে বললে,—যে অবস্থায় সেদিন কয়েক মুহূর্তের জন্যে আমায় দেখেছিলেন তাতে আমার মত নগণ্য ব্যক্তির চেহারা আপনার মনে থাকবে ভাবিনি

সেদিনের আগেই আপনাকে দেখেছি। আপনার কীর্তিকলাপও কিছু কিছু জানি।—স্বরটা প্রায় রূঢ়।

আমার কীর্তিকলাপ! আপনি জানেন!—অসীমের বিস্ময়টা এবার সম্পূর্ণ ভান নয়।

হ্যাঁ জানি। জানবার সৌভাগ্য হয়েছে। কিছুদিন আগে জাল ওষুধের ব্যবসার নাড়িনক্ষত্র জানিয়ে দিয়ে দেশের লোককে চমকে দিয়েছিলেন। এবার আর কি জাল ধরতে বেরিয়েছেন?

শুধু কেবল জালের পেছনেই ছুটি, ভাবছেন কেন? আর খাঁটি জিনিসের সন্ধানেও কি আমাদের ফিরতে নেই!

ফিরতে মানা নেই। কিন্তু তা থেকে রসালো ঝাঁঝালো তো কিছু গাঁজিয়ে তোলা যায় না। সুতরাং ওসব বস্তুতে আপনাদের অরুচি।—মলি চৌধুরীর কণ্ঠে ঘৃণারই আভাস যেন।

আপনি কিন্তু আমায় ভুল বুঝেছেন!

ভুল বুঝে থাকলে আমি দুঃখিত।—মলি চৌধুরী হঠাৎ কি ভেবে হেসে উঠল। তারপর তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গের সুরে বললে,—ভুলটা আপনি সংশোধন করে দিতেও তো পারেন?

কি করে!—অসীমের প্রশ্নটা সরল।

কেন!—মলি চৌধুরীর গলায় সেই কৌতুকে বিদ্রূপে মেশানো সুর,—আমার সঙ্গে একটু প্রেম করবার চেষ্টা করে? সুযোগ তো আপনার অবাধ। আপনি যদি হাতটা বাড়িয়ে আমাকে কাছেও টানেন আমি বড়জোর একটু বাধা দিতে পারব। কিন্তু চিৎকার করে লোক ডাকতে পারব না। ডাকলেও কেউ আমার কথা বিশ্বাস করবে না। আমারই গাড়িতে নিজে চালিয়ে আমি

আপনাকে এই নির্জন জায়গায় এনেছি। আমিই যে প্রধান ভূমিকা নিয়েছি তার সাক্ষীরও অভাব হবে না। এ সুযোগটাও আপনি নিতে পারছেন না, শহরের অনেক ধারালো শাঁসালো তরুণের মাথা যে এখনো ঘুরিয়ে দিচ্ছে তেমন একজন সুন্দরী—সুন্দরীই বা নয় কেন—মেয়েকে এমন অসহায়ভাবে বেকায়দায় পেয়ে? আপনার বয়স তো এমন কিছু বেশী মনে হয় না। চেহারাটাও চলনসই। কিন্তু খবরের কাগজ ঘেঁটে ঘেঁটে ভেতরটা কি কাগজের মতই নীরস শুকনো হয়ে গেছে নাকি?

এক নিশ্বাসে এতগুলো কথা অনর্গল স্রোতে বলে গিয়ে মলি চৌধুরী হঠাৎ হাসতে আরম্ভ করলে। সাধারণ কৌতুকের হাসি নয়। প্রায় অপ্রকৃতিস্থ হিস্টিরিয়ার হাসি।

অসীম সত্যিই স্তম্ভিত।

যেমন আচমকা হাসতে শুরু করেছিল তেমনি হঠাৎ হাসি থামিয়ে ইঞ্জিনের চাবিটা ঘুরিয়ে দিয়ে মলি চৌধুরী শান্ত গম্ভীর স্বরে বললে,—প্রহসন ঢের হয়েছে। এবার চলুন আপনাকে অফিসে পৌঁছে দিয়ে যাই। আপনার কাগজের অফিসেই যাবেন নিশ্চয়।

অসীম জবাব দিল না। ড্যাসবোর্ডের মৃদু আলোতেই মলি চৌধুরীর চোখের পাতায় যেন জলের ফোঁটা দেখা যাচ্ছে মনে হল। কিংবা হয়ত তার মনের ভুল।

মলি চৌধুরীই আবার বললে,—ভাবছেন, কেন এমন প্রহসন করলাম, কেমন? আপনার সন্ধ্যেটার এত তোড়জোড় একেবারেই মাটি হল৺

না, তা কেন ভাবব!—অসীম প্রতিবাদ করে আরো কিছু হয়ত বলত, মলি চৌধুরী তাকে থামিয়ে দিয়ে বললে,—ভয় নেই, একেবারে তা হবে না। আপনার খাঁই যত বড়ই হোক একটা খবর অন্তত আপনাকে দিচ্ছি যা পেলে আপনার মত মানুষের

বর্তে যাওয়া উচিত। উমাপতির বিষয়েই আপনি ইতিহাসের মশলা খুঁজে বেড়াচ্ছেন তো? আকাশ পাতাল যার জন্যে চষে ফেলতে পারতেন তেমনি একটা মশলা আপনাকে অযাচিত-ভাবে দিচ্ছি, দেবার জন্যেই এখানে এসেছি। শুনুন, উমাপতি ঘোষালকে আমি ভালবাসতাম, যে ভালবাসা সব বিচার ভাসিয়ে দেয়—স্থান কাল পাত্র ভুলিয়ে দেয়—সেই ভালবাসা। আরো জেনে রাখুন, পাথরের দেবতাকে ভালবেসেছিলাম। ব্যস আপনার কল্পনার অতীত নিশ্চয় কিছু পেয়েছেন, আর কখনো আমায় বিরক্ত করবেন না, আমার পিছু নেবেন না। আমাদের বাড়িতেও আপনার ছায়া যেন না পড়ে।

মোটরটা গর্জন করে মলি চৌধুরীর দুরন্ত রাগের জ্বালার মতই রাস্তা কাঁপিয়ে ছুটে বেরিয়ে গেল।

নয়

আজ ছুটির দিন।

জয়া সারাদিন বাড়ি থেকে বার হয়নি। বার হবার উৎসাহই বোধ করেনি। সারাদিন আজ আকাশের মুখ ভার। সারাদিন থেকে থেকে বৃষ্টি পড়ছে।

বৃষ্টি হলে অসুবিধে বড় কম হয় না।

একটি ছোট ঘর আর বারান্দা নিয়ে জয়ার বাসা। ঘর আর বারান্দাটা দোতলায়। কিন্তু রান্নাঘর কল সব নিচে। বাড়িওয়ালা সপরিবারে নিচেই থাকেন। তাঁরই রান্নাঘরের মাঝখানে একটা দেয়াল তুলে জয়ার জন্যে খানিকটা জায়গা আলাদা করে দেওয়া হয়েছে। কলঘর ইত্যাদি এজমালি।

নিচে নামবার সিঁড়িটা উদোম। ওপরে ঢাকা নয়। বর্ষার দিন নামতে উঠতে ভিজে যেতে হয়।

জয়া আজ রান্নাঘরে যায়ই নি। সকালে স্নানটান করেই ওপরে উঠে এসেছে। ওপরে এসে চা-টা স্টোভেই করে নিয়েছে। দুপুরেও নিচের ঠিকে ঝিকে দিয়ে বাজার থেকে কিছু খাবার আনিয়ে খেয়েছে। রাত্তিরে যা হোক দেখা যাবে।

এমন ব্যবস্থা তার নতুন নয়। আগেও অনেক বার করেছে। ছাত্রীদের পরীক্ষার অনেকগুলো খাতা জমে আছে। আজ সেগুলো সেরে ফেলাই তার সঙ্কল্প।

খাতা দেখা কিন্তু কিছুতেই এগুচ্ছে না। মনে হচ্ছে নম্বর দিতে যেন ভুলটুল হয়ে যাচ্ছে। জয়া এ বিষয়ে অত্যন্ত কর্তব্যপরায়ণ ন্যায়নিষ্ঠ। পাছে অবিচার হয় এই ভয়ে সে অত্যন্ত সাবধান।

কিন্তু আজ উত্তরগুলো যেন ঠিকমত বিচার করতেই পারছে না।

আজ কেন, ক'দিন থেকেই এই মনোযোগের অভাব। কবে থেকে তা জয়া ইচ্ছে করেই হিসেব করতে চায় না।

খোলা খাতাটা মুড়ে অন্য সবগুলোর সঙ্গে সরিয়ে চাপা দিয়ে রেখে দেয়। থাক, এখন জোর করে দেখবার চেষ্টা করলে ভুল আরো বেশী হবে। দৃষ্টিটা খাতার ওপর থেকে বাইরেই চলে যাচ্ছে।

এ ঘরের একটি মাত্র সুবিধে ,এই যে, সামনে অনেকখানি ফাঁকা পাওয়া যায়।

দক্ষিণে ক'টা টিনের চালাঘর। বাড়িওয়ালারই সম্পত্তি। গরীব ক'ঘর গৃহস্থ সেখানে ভাড়া করে থাকে।

সেই টিনের চালা আর তার আশপাশের কলা পেঁপে গাছের মাথার ওপর দিয়ে বড় দীঘিটার ওপার পর্যন্ত দেখা যায়। সামনের দিকটাই শুধু এই টিনের সব চালা ঘরে আড়াল। নইলে দীঘিটার বাকি সবটুকুই চোখের সামনে অবারিত।

আজ থেকে থেকে বৃষ্টি-পড়া বাদলার আকাশের ম্লান আলোয় দীঘিটার যেন রূপান্তর হয়েছে। ওপারের ভাঙা বাঁধানো ঘাটটায় আজ আর লোকজন নেই বাদলার দরুণ। অন্যদিন দুপুর বেলাতেও ফাঁকা থাকে না একেবারে। এ তল্লাটের সঙ্গতিহীন মানুষদের কাছে এই দীঘিটিই একটা পরম আশীর্বাদ—স্নান করবার, বাসনকোষণ ধোবার, রান্নার, খাবার জলও নেবার। অন্য দিন তাই ভীড় লেগে থাকে সারাদিন। দীঘির জলটাও যে নোংরা হয়ে এসেছে সংস্কারের অভাবে তা লক্ষ্য না করে পারা যায় না।

আজ কিন্তু বৃষ্টির ফোঁটায় রোমাঞ্চিত দীঘির জল যেন সে সব গ্লানি মলিনতা ভুলে গিয়েছে। শুধু একটা রহস্যময় প্রশান্তি তার ওপর প্রসারিত। মাঝে মাঝে দমকা হাওয়ায় খানিকটা জল শিহরিত হয়ে উঠছে মাত্র এখানে সেখানে, নইলে একটা ঈষৎ স্বচ্ছ রহস্য-যবনিকার অবিরাম আনন্দ স্পন্দন।

এইটুকুই তার বিলাস, এইটুকুতেই তার ক্ষণিক আত্মবিস্মরণ।

এই দীঘির দৃশ্যটুকুর লোভেই অনেক অসুবিধা সত্ত্বেও এই বাসা ভাড়া নিয়েছিল মনে আছে। তারপর অসুবিধা বেড়েছে। বাড়িওয়ালার সঙ্গে তেমন বনিবনাও নেই। তবু এ বাসাটা ছাড়তে মন ওঠেনি। ওই দীঘিটাই হয়ত তাকে বেঁধে রাখবার একমাত্র কারণ নয়। কিন্তু সেইটেই প্রধান।

ওপরের এই নিজের ঘরটিতে এলে অন্তত সে একলা হবার আশা করতে পারে। আশা সব সময়ে পূর্ণ হয় না। বাড়িওয়ালাদের আসা যাওয়া ইদানীং মনকষাকষির দরুণ বন্ধ হয়েছে, কিন্তু ছাত্রীরা কি স্কুলের সহকর্মীদের কেউ কেউ মাঝে মাঝে এসে উপস্থিত হয়। ভদ্রতার খাতিরে তাদের আপ্যায়নও করতে হয়।

পৃথিবীতে কারুর সঙ্গ সে যে আর চায় না সে কথা কেমন করে কা'কে জানাবে!

এ বাসায় কতদিন তার কাটল?

তা এক যুগ বলেই মনে হয়। উমাপতির সেই কাগজটা উঠে যাবার কিছুকাল পরই।

উমাপতি তার 'আন্দামান' থেকে বেরিয়ে এসে আবার এক কাজের উৎসাহের আকস্মিক জোয়ারে হঠাৎ নির্বাচন যুদ্ধে দাঁড়াবে ঠিক করেছিল।

সে কি বিশৃঙ্খল উত্তেজনা আর ব্যস্ততার দিনই গিয়েছে!

জয়াও প্রথমটা মেতে উঠেছিল।

সারাদিন সেই লোকের ভীড়, অভিযানের নানান দিকের ব্যবস্থা, উমাপতির সঙ্গে এখানে সেখানে সভায় যাওয়া।

উমাপতির কাছে তখন রথী মহারথীরা আনাগোনা করছেন তাকে ছোট বড় নানা দলে টানবার জন্যে।

উমাপতি রাজী হয়নি কোন দলের সঙ্গে নিজের নাম জড়াতে। সে একাই তার দল ও দলের নেতা। যাঁরা বোঝাতে আসতেন তাঁদের সে বলত,—আপনাদের অনেক কথা আছে বলবার, আমার

শুধু একটা কথা। সেই একটা কথা আমি একলাই বলতে চাই যত ক্ষীণই আমার কণ্ঠ হোক। সেই একটা কথা বলবার অধিকার আমায় যদি দেশের লোক দেয় তাহলেই আমি কৃতার্থ।

দেশের লোকের কাছে প্রথম দিকেই সাড়া যা পাওয়া গিয়েছিল তাও প্রায় আশাতীত।

উমাপতি ঘোষালের আবেদন আর পাঁচজনের মত নয়। সে বড় বড় ময়দানে পার্কে বিরাট কোন সভা ডাকে না।

কোথাও কোন গলির মোড়ে, কারুর বাড়ির উঠোনে, বড় জোর ছোটখাট পার্কে তার সভা। দীর্ঘ বক্তৃতা নয়, আস্ফালন উচ্ছ্বাস নয়, চিৎকার নয়। দৃঢ়কণ্ঠে কয়েকটি শুধু কথা,—কি করব আমায় জিজ্ঞাসা করবেন না। স্রোত বুঝে নৌকোর হাল ধরতে হয়। আমার কাছে আশ্বাস চাইবেন না। আমায় বিশ্বাস করতে পারেন কি না তাই বিচার করে দেখুন। আমি আকাশের চাঁদ পেড়ে দেব না, শুধু আমার যা হক্ তা দেব না কাউকে কেড়ে নিতে। আমার হক্-ই আপনার হক্, আপনাদের সকলের।

বিশ্বাস লোকে করেছিল।

ভয় পেয়েছিল বিরুদ্ধপক্ষ।

উমাপতি ঘোষালের কোন সম্বলই নিজের ছিল না। কিন্তু নির্বাচনে দাঁড়ানো শূন্য ঝুলিতে হয় না। কিছু অন্তত রসদ দরকার হয়। সেই রসদ যোগাবার ভার স্বেচ্ছায় অযাচিতভাবে দু'একজন উৎসাহী ভক্ত নিয়েছিল।

বিপক্ষ দলের ফুসলানিতে তাদের মধ্যে ভাঙন ধরল প্রথম। একজন গা ঢাকা দিলে বেমালুম।

উমাপতির গ্রাহ্য নেই। শুধু টাকার জোরে নির্বাচনের সংগ্রামে জয়ী হওয়া যায়—এ ধারণাই সে পাল্টে দেবে। জনসাধারণকেই আত্মবিশ্বাসে অটল করতে হবে। তাদের আত্মসম্মান জাগাতে হবে। গণতন্ত্রের কোন মানেই হয় না গোড়াতেই যদি তার গলদ

হয়। গোড়া হল প্রত্যেকটি মানুষ নিজে। তার সততা, তার সৎসাহসই হল সব কিছুর ভিত্তি। সে যদি নিজেকে ফাঁকি দেয় তাহলে গোটা কাঠামোটাই ফক্কিকার। ফাঁকি সে ইচ্ছে করে সব সময়ে দেয় না। ফাঁকা বুলির মোহে পড়ে প্রতারিত হয়। তাই কথাকে নয়, মানুষকে বিশ্বাস করতে হবে। বিশ্বাস করবার মত মানুষ খুঁজতে হবে।

এই সময়ে একজন পাহাড়ের মত অটল আশ্বাস দিয়ে পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলেন অযাচিত ভাবে।

নিশীথ পাত্র।

নিশীথ পাত্র অন্য দলের সঙ্গে জড়িত। কিন্তু বিনা দ্বিধায় প্রকাশ্যভাবে তিনি উমাপতিকে সমর্থন করেছেন শুধু তাঁর উপস্থিতি দিয়ে।

নিশীথ পাত্র কোন সভায় দাঁড়িয়ে কিছু কখনও বলেননি। কিন্তু তাঁকে ঘরে বাইরে অধিকাংশ জায়গায় উমাপতির পাশে দেখা গিয়েছে।

সেই শুভ্রকেশ সৌম্যমূর্তি তাপস, চেহারা চরিত্র সব কিছুতে যাঁকে উমাপতির সম্পূর্ণ বিপরীত বলা যায়।

উমাপতি যেন একটা প্রচণ্ড বহ্নি-বিস্ফোরণের বেগ নিজের মধ্যে সংবরণ করে নিয়ে ফিরছে। তার মুখে চোখে চলায় ফেরায় তারই তীব্র ছটা যেন লুকোন যায় না।

উমাপতির তখন মাথায় অবিন্যস্ত দীর্ঘ চুল, এক মুখ দাড়ি। নাতিদীর্ঘ রোগাটে দেহ নমনীয় অথচ বজ্রকঠিন ইস্পাত দিয়ে তৈরী মনে হয়।

মুখের মধ্যে চোখ দুটো যেন বেমানান।

দীর্ঘায়িত চোখ নয়। কিন্তু তার মধ্যে দুর্বোধ রহস্যময়তার সঙ্গে একটা ক্ষুধিত আবেগ কি করে যেন মিশে আছে।

উমাপতির চোখের অন্য রূপও জয়া দেখেছে। তার চোখ সত্যিই

বুঝি তার সত্তার মুকুর ছিল। ভেতরের আলোড়ন উত্তেজনা সে চোখে কেমন করে প্রতিফলিত হয়ে উঠত। আবার কখনও সে দৃষ্টি কৌতুক প্রসন্নতার আভাস দিয়ে শান্ত সমাহিত হয়ে যেত।

তখন উমাপতির মধ্যে একটা আলোড়নের পর্ব চলেছে।

সে আলোড়ন শুধু এই রাজনীতিতে নামা নিয়েই নয়।

দশ

রাজনীতিতে নামা কিন্তু বিপর্যয়ই ডেকে এনেছে। কল্পনাও যেদিক থেকে করা যায়নি সেদিক থেকে নিচের পাঁক ঘুলিয়ে উঠেছে।

আপনা থেকে ঘুলিয়ে ওঠেনি, যাদের স্বার্থ আছে তারাই ঘুলিয়ে তুলেছে সময় বুঝে।

গোড়ায় একটু কানাঘুষা শোনা গেছে।

তারপর প্রকাশ্য চিঠি খবরের কাগজে।

প্রথমে যে চিঠি বেরিয়েছে তা এমন মারাত্মক কিছু নয়। জনৈক পাঠক প্রশ্ন করেছে উমাপতি ঘোষালের সমর্থকদের সম্বন্ধে। নাম না করেও সুস্পষ্ট ইঙ্গিত দিয়ে জানতে চেয়েছে যে উমাপতি ঘোষালের নির্বাচন আন্দোলনের মোটা ব্যয় যিনি জোগাচ্ছেন তিনি কুখ্যাত দেশদ্রোহী পূর্বের দল থেকে বিতাড়িত একজন উচ্ছৃঙ্খল ধনী-সন্তান কি না?

কথাটা অর্ধ সত্য। তাই কিছুটা গোল বাধিয়েছে।

দলছাড়া একজন স্বাধীনচেতা সুপরিচিত ব্যক্তি সত্যিই উমাপতিকে সমর্থন জানিয়েছেন।

তিনি ধনীও বটে, ব্যক্তিগত চরিত্রও হয়ত তাঁর নিষ্কলঙ্ক নয়।

কিন্তু তাঁর কাছে কণামাত্র অর্থ সাহায্যও উমাপতি নেয়নি।

উমাপতি এ চিঠির প্রতিবাদ পর্যন্ত করেনি ঘৃণায়। মিথ্যা কুৎসার ধোঁয়া আপনিই মিলিয়ে গেছে কিছুদিন বাদে।

কিন্তু নির্বাচনের তারিখ এগিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে বিপক্ষেরা আরো হিংস্র হয়ে উঠেছে।

প্রথমে ইঙ্গিত ইশারা তারপর স্পষ্ট কলঙ্ক লেপন করেছে

উমাপতির নিজের চরিত্রে। কুৎসিত ভাষায় ইস্তাহার ছাপিয়ে বিলি করেছে।

উমাপতির ব্যক্তিগত জীবনই তার আলোচ্য।

লিখেছে, উমাপতি ঘোষালের একটি নিভৃত গোপন গোকুল আছে সে কথা সবাই জানে কি?

উমাপতির 'আন্দামান'কেই মিথ্যা রংচং-এর প্রলেপ লাগিয়ে বর্ণনা করেছে। বলেছে, উমাপতি সেখানে রাসলীলা করে, জনসাধারণের কথা আর ভাববার সময় পাবেন কখন?

একটার পর একটা এরকম জঘন্য কুৎসা মাখানো কাগজ ছেপে ছড়িয়েছে।

শেষের দিকে একটা কাগজে জয়ার নাম দিতেও পেছপাও হয়নি।

কে এই জয়া নামে মেয়েটি?—সাধারণের কাছে প্রশ্ন তুলেছে। —এ মেয়েটির সঙ্গে উমাপতিকে প্রায় সর্বত্র অবিচ্ছেদ্যভাবে দেখা যায় কেন? বুঝ নর যে জানো সন্ধান!

জয়া স্তম্ভিত হয়েছে। উমাপতি কিন্তু তখনও নির্বিকার।

কিন্তু বিপক্ষের এ ব্রহ্মাস্ত্র ব্যর্থ হয়নি।

উমাপতির ছোট অন্তরঙ্গ সভার ভেতরে থেকেও একজন হঠাৎ একদিন টিট্‌কিরি দিয়ে উঠেছে,—জয় জোড়ের পায়রা কি! ও ধনীটি কে বাবা?

সেদিন সভায় যারা উপস্থিত তাদের অনেকেই রেগে লোকটাকে বার করে দিয়েছে। কিন্তু তারপর উল্টো দিকেই হাওয়া বইতে শুরু করেছে।

উমাপতির সঙ্গে আরেক সভায় গিয়ে দেখেছে বড় করে একটা পোস্টারের মত কাগজে লাল কালিতে লেখা—উমাপতি না উপপতি!

সেইদিন উমাপতির এমন এক অগ্নিমূর্তি জয়া দেখেছে যা কোনদিন ভোলবার নয়।

সেই লেখাটা সামনে ধরে রেখে উমাপতি বলে গেছে তার কথা। বক্তৃতা নয়—আগ্নেয়গিরির লাভা স্রোত। এই সমাজ এই দেশ এইসব কৃমিকীটের মত মানুষ সম্বন্ধেই তার অগ্ন্যুদ্গার।

তার সে ভাষণে বুঝি পাহাড় টলে যায়। সমবেত জনতার মনেও আগুন ধরে গেছে। তারা নিজেরা এগিয়ে এসে সে কাগজ পুড়িয়ে বারবার স্বতস্ফূর্ত জয়ধ্বনি দিয়ে উঠেছে।

উমাপতি সেদিন জয়ী হয়েছে।

কিন্তু জয়া সে সভা থেকে ফিরে এসেছে একেবারে যেন অন্য মানুষ হয়ে। তার ভেতরটা কে যেন চুরমার করে দিয়েছে, জগৎটাই ওলটপালট হয়ে গেছে।

উমাপতির এ সাময়িক জয়ে সে কোন সান্ত্বনা পায়নি। কি দাম এই ক্ষণিক সাফল্যের ?

পরাজয়ও এখানে যেমন অর্থহীন, জয়ও তাই।

একটা অন্ধ বিচারহীন জড় প্রবাহ।

ঢেউ-এর মাথায় আকাশে তুলতেও যেমন, তলার পাঁকে চুবিয়ে মারতেও তেমনি বেশী কিছু লাগে না। বেশীক্ষণও নয়।

এই প্রবাহের অচেতনতা যতদিন না দূর করতে পারছে ততদিন কিছুতে কিছু হবে না। একা উমাপতি ঘোষালের সাধ্য তা নয়। উমাপতি হয়ত বৃথাই নিজেকে বলি দিচ্ছে।

উমাপতি নিজেকে উৎসর্গ করতে চায় করুক। সে বাধা দেবার কে ? বাধাও দেবে না, তার লজ্জার ভার হয়েও থাকবে না।

জয়া একেবারে নিজেকে অপসারিত করে দিয়েছিল উমাপতির জগৎ থেকে। এক মুহূর্তে কোন চিহ্ন না রেখে।

সেই তখনই এই বাসাটি খুঁজে বার করে এক রাত্রের মধ্যে উঠে এসেছিল, কোন ঠিকানা না রেখে। মর্মান্তিক ভাবে তখন সে আহত ; দেহে মনে, আর আত্মা বলে যদি কিছু থাকে তাতেও।

তার সেই ক্ষতগুলি নিয়ে সে একটু নির্জনে নিজেকে নির্বাসিত

করতে চেয়েছে—সকলের চোখের অন্তরালে। আহত পশু যেমন করে তার গোপন গুহায় গিয়ে শয্যা নেয় তেমনি।

এ ক্ষত কি শুধু এই নোংরা নীচ রাজনীতির জগতের বিষাক্ত শরের ?

না, তা নয়। তবে এই শেষ আঘাতই তার জর্জর সত্তাকে একেবারে যেন ধূলিসাৎ করে দিয়েছে।

বিস্ময়ের কথা এই যে, নিজের বেদনা জর্জরতা এতদিন বুঝি সে নিজেই ভালো করে উপলব্ধি করেনি। কিংবা স্বীকার করতে চায়নি নিজের মনের কাছে স্পষ্ট করে।

উমাপতির নতুন উদ্দীপনা তাই সে সঞ্চারিত করতে চেয়েছিল নিজের মধ্যে।

একটা দুঃসাধ্য সাধনের নেশায় নিজেকে মাতিয়ে ভুলে থাকতে চেয়েছিল আর সবকিছু।

কিন্তু পারল কই !

নিজের ক্ষতবিক্ষত চেহারাটা নিজের কাছে আর আড়াল রাখা গেল না।

এগার

কবে থেকে এই বেদনাবোধের সূত্রপাত ?

সন তারিখ ধরে বলতে পারবে না। তবে উমাপতির কাগজ যখন প্রায় ওঠে ওঠে, ধীরে ধীরে নিজেই যখন সে পত্রিকার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে উদাসীন হয়ে তার সেই 'আন্দামানে' এক এক ঝোঁকে দীর্ঘদিনের জন্যে আত্মগোপন করতে শুরু করেছে তখন থেকেই সন্দেহ নেই।

নাম না থাকলেও জয়া-ই তখন কাগজের প্রায় সব কিছুই দেখে।

দেখতে হয় বাধ্য হয়ে।

উমাপতি এক-আধদিন এসে হঠাৎ একেবারে বহুদিনের জন্যে নিখোঁজ হয়ে যায়। জয়া অনুযোগ করলে কথা দেয় নিয়মিত আসবার। কিন্তু কথা রাখে না।

কাগজ চালানো এদিকে দায় হয়ে উঠেছে।

চারিদিকে দেনা বাড়ছে। প্রেসের দেনা, কাগজের ব্যবসাদারের দেনা।

কাগজের বিক্রি তখনও কমেনি। কিন্তু বিজ্ঞাপন সংগ্রহের ব্যবস্থা অত্যন্ত অগোছালো। যাও বিজ্ঞাপন আছে তার মূল্য আদায় ঠিকমত হয় না। একা জয়ার পক্ষে এত সব কিছু করা সম্ভব নয়।

সাহায্য করবার আছে কেউ কেউ। কিন্তু তাদের প্রায় সকলেরই শখের চাকরি। প্রথম দিকে যারা ভীড় করেছিল তাদের অনেকের উৎসাহে ভাঁটা পড়ায় সরে গেছে। উমাপতির নিজের ঔদাসীন্যেও অনেকে নিরুৎসাহ হয়ে বিদায় নিয়েছে।

পারেনি শুধু জয়া। সে একদিন বিরুদ্ধ সমালোচক হিসেবেই এসেছিল। কিন্তু তারপর কবে কি করে জড়িয়ে পড়েছে, সে আরেক ইতিহাস।

অদম্য জেদ জয়ার চরিত্রের একটা প্রধান লক্ষণ। কাগজটার সঙ্গে জড়িয়ে পড়ার পর সে দুর্যোগ দেখে নিজেকে ছাড়িয়ে নিতে পারেনি। কিন্তু অনিয়মিত ভাবে বেরুতে বেরুতে কাগজটার ক্রমশ প্রায় অচল অবস্থা হয়ে পড়েছে। কাগজের দেনা নিয়ে এমন একটা সমস্যা উঠেছে যে, এখুনি তার মীমাংসা না করলে নয়।

অনেকদিন উমাপতির দেখা নেই।

জয়া নিজেই একদিন অধৈর্য হয়ে গেছে তার সেই সুদূর আস্তানায়, সেই আন্দামানে।

এই বুঝি তার তৃতীয়বার সেখানে যাওয়া। নিজে থেকে যাওয়া এই প্রথম। এর আগে উমাপতির সঙ্গেই গেছে দু'বার। গেছে উমাপতিরই অনুরোধে।

পথ সে চেনে। কিন্তু এবার যেন আরো বেশী দুর্গম মনে হয়েছে।

তখনও এমনি বর্ষার দিন।

বাস থেকে যেখানে নেমেছে সেখান থেকে গন্তব্য দিকটা স্থির করতে অসুবিধায় পড়েছে।

বাসের কণ্ডাক্টারকে জিজ্ঞাসা করেছিল। কণ্ডাক্টার বাস যে সব জায়গায় থামে সেই সব ঘাঁটির নামটামই জানে। এ বিষয়ে কিছু সাহায্য করতে পারেনি। বাসের দু'চার জন যাত্রী একটু-আধটু ভাসাভাসা হদিস দিতে পেরেছে মাত্র।

এর আগে ক'বারই উমাপতির সঙ্গে গাড়িতে এসেছিল বলে এই অসুবিধা।

তবু শেষ পর্যন্ত জয়া পথ খুঁজে বার করেছে। বর্ষার দিনে সে পথ এমন দুর্গম হবে শুধু কল্পনা করতে পারেনি।

বড় রাস্তা থেকে দু'ধারের ধানক্ষেতের ভেতর দিয়ে কাঁচা আলের পথ। জলে কাদায় পেছল। মাঝে মাঝে আবার বর্ষার জল এ ক্ষেত থেকে ও ক্ষেতে বইবার সুযোগ করে দেওয়ার জন্যে নালা কাটা।

পথটাও সেদিন অনেক দূর মনে হয়েছে। যাবার অসুবিধের

জন্যে বোধহয়। কিংবা আগে উমাপতির সঙ্গে গল্প করতে করতে গেছে বলে খেয়াল করেনি।

বেশ কিছুটা হাঁটবার পর সেই জলা পেয়েছে, আর জলার মধ্যে সেই দ্বীপটুকু।

বাঁশের নড়বড়ে সাঁকোর ওপর দিয়ে যাবার সময় কিন্তু যে জন্যে আসা—উদ্বেগ অধৈর্য আর পথের এই কষ্ট যেন ভুলে গিয়ে কেমন একটা উত্তেজনাই অনুভব করেছে। উমাপতিকে চমকে দেবার একটা ছেলেমানুষী আগ্রহ।

কিন্তু কোথায় উমাপতি?

ঘর তো আসলে একটা। চারিদিকের জলার মধ্যে দ্বীপও ওইটুকু।

কোথাও উমাপতি নেই।

ঘরের দরজা বন্ধ নয়। উমাপতির দরজা বন্ধ করবার দরকার হয় না। দরজায় খিলই নেই বন্ধ করবার।

ঘরে আগেও যেমন দেখে গেছে তেমনি কোনরকমে দিন কাটাবার নেহাৎ যা না হলে নয় সেই যৎসামান্য উপকরণ।

কম্বল আর গেরুয়া চাদর বেছানো একটি দড়ির খাটিয়া। একটা কেরোসিন কাঠের টুল আর ছোট টেবিল। দড়ির আলনায় ঝোলানো ক'টা ধুতি-পাঞ্জাবি। এক কোণে একটা সরা ঢাকা মাটির কলসির ওপর একটা কাঁচের গ্লাস। পাশের ছোট ঘরটায় রান্নাবান্নার অতি সংক্ষিপ্ত ব্যবস্থা। একটা কেরোসিনের স্টোভ, একটা এলুমিন্যমের ডেকচি আর ফ্রাই প্যান, চীনে মাটির ক'টা বড় ছোট ডিশ আর পেয়ালা। কেরোসিনের বোতলটা এক কোণে রাখা, তার পাশে দুটো হ্যারিকেন লণ্ঠন। একটা জলের বালটি, একটা টিনের মগ আর এক পাশে চাল ডাল নূন তেলের ক'টা হাঁড়ি-কুঁড়ি শিশি। কাপড়কাচা সাবান, তোয়ালেও আছে।

সব কিন্তু পরিষ্কার পরিচ্ছন্নভাবে গোছানো। বিছানার চাদর থেকে আলনায় ঝোলানো ধুতি-পাঞ্জাবি সব কাচা ধবধবে।

বাইরে থেকে দেখে যাকে অত্যন্ত এলোমেলো অগোছালো মনে হয় তার এও একটা অপ্রত্যাশিত অজানা দিক।

অত্যন্ত আশাহত হয়ে কি করবে ভেবে না পেয়ে অসহায় বোধ করার দরুণই বোধহয় জয়া অত খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সব কিছু দেখেছিল। দেখতে দেখতে দুর্বোধ একটা অস্পষ্ট ব্যথা ও কেন যে অনুভব করেছিল কে জানে!

পৌঁছতেই বিকেল হয়ে গেছে। মেঘলা আকাশ খানিক বাদেই অন্ধকার হয়ে আসবে। আর বেশীক্ষণ অপেক্ষা করা যায় না।

একটা চিঠি লিখে রেখে যাবার জন্যে টেবিলের ওপর থেকে একটা কাগজ নিয়েছে। কিন্তু কি ভেবে আর লেখেনি। এখানে আসার কোন চিহ্ন না রেখেই বেরিয়ে পড়েছে।

সেই জল-কাদার পিচ্ছিল পথ দিয়ে সন্তর্পণে ফেরবার সময়ই একটি মাত্র মানুষের সঙ্গে এতক্ষণে দেখা হয়েছে। চাষীগোছের মানুষ।

তাকে কিছু জিজ্ঞাসা করবারও দরকার হয়নি। বিস্ময়ে কৌতূহলে জয়াকে লক্ষ্য করতে করতে তাকে পার হয়ে গিয়ে সে আবার ফিরে দাঁড়িয়েছে।

নিজে থেকেই বলেছে, আপনে পাগলাবাবুরে খোঁজ করতি এয়েছিলেন?

পাগলাবাবু যে কার সম্মানের আখ্যা হতে পারে তা বুঝতে জয়ার অসুবিধে হয়নি। হাসি চেপে সে জিজ্ঞাসা করেছে,—হ্যাঁ, তিনি কোথায়? ঘরে তো নেই দেখলাম।

তেনাকে যে দুপর বেলায় কোথা নিয়ে গেল! জব্বর একখানা হাওয়াগাড়ি এসে হুই হোথা রাস্তার ধারে দাঁড়িয়েছিল।

একটু চুপ করে থেকে জয়া নিরর্থক জেনেও প্রশ্নটা না করে পারেনি,—কে এসেছিল মোটরে, জানো?

আমি চাষাভুষো মানুষ! আমি জানব কেমনে? কোথাকার

রানী-টানি হবে নিশ্চয়। তেনার ডেরাইভারকে আমি পথ দেখিয়ে নিয়ে গেনু যে!

জয়া আর কোন প্রশ্ন করেনি। নিঃশব্দে ফিরে গিয়ে রাস্তার ধারে ফিরতি বাসের জন্যে অপেক্ষা করেছিল।

উমাপতিকেও দেখা হবার পর সে কোন প্রশ্ন করেনি।

দেখা তার পর দিনই হয়েছিল কাগজের অফিসেই। উমাপতি এসেছিল নিজে থেকেই।

কাগজের সমস্যা সম্বন্ধেই উমাপতির সঙ্গে আলোচনা করেছিল। সমস্যা যা দাঁড়িয়েছে সমস্তই জানিয়েছিল।

কাগজের ও প্রেসের দেনার দায়ে হয় কাগজ বন্ধ করতে হবে, নয় প্রেসের মালিক যে প্রস্তাব করেছেন তাতে রাজী হতে হবে।

প্রেসের মালিক অত্যন্ত কুণ্ঠিতভাবে জানিয়েছেন যে, তাঁর পক্ষে আর কাগজ ছেপে দেওয়ার ভার নেওয়া সম্ভব নয়। তবে উমাপতিবাবু যদি কাগজটা সম্পূর্ণ তাঁর হাতে ছেড়ে দেন তাহলে তিনি একবার শেষ চেষ্টা করে দেখতে পারেন চালাবার।

কাগজের দেনাটেনা যা আছে তার সব দায় প্রেসের মালিকই নেবেন। সেদিকে উমাপতিবাবুকে কিছু ভাবতে হবে না। কাগজ যেমন আছে তেমনি তাঁরই থাকবে। শুধু নিয়মমত দেখাশোনার অভাবে যে সমস্ত গোলমাল হচ্ছে তা বন্ধ করবার চেষ্টায় ব্যবসার দিকটা প্রেসের মালিক নিজের হাতে নিয়ে একবার দেখতে চান।

উমাপতির কাছে এসব কথা তুলতে সঙ্কোচ হয় বলেই জয়ার মারফত এই নিবেদন।

উমাপতি সমস্ত শুনে খানিক চুপ করে থেকে জয়াকেই জিজ্ঞাসা করেছিল,—তোমার কি মত?

এ প্রস্তাবে রাজী হলে দোষ কি?—বলেছিল জয়া,—সত্যিই ব্যবসার দিকটা তো আমরা বুঝি না। সেদিকটা ঠিকমত দেখাশুনা হলে কাগজটা চলতে পারে।

হ্যাঁ ব্যবসা হিসেবে চলতে পারে !—বলে উমাপতি যেন অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিল।

শুধু ব্যবসা হিসেবে কেন ? কাগজ তো আমাদেরই হাতে। আসল যা জিনিস তা যা ছিল তাই থাকবে।

তা থাকে না।—উমাপতি একটু হেসে বলেছিল,—তেল যে জোগায় সলতে কমানো বাড়ানো তারই হাতে।

ওটা শুধু উপমা হল।—জয়া তর্ক করেছিল,—শুনতে ভালো, কিন্তু সম্পূর্ণ খাটে না। তাছাড়া আপনার উপমাতেই বলি, তেল না হলে সলতে তো নিবে যাবে।

তাই যাক। ধার-করা তেলে জ্বলার চেয়ে নেবা ভালো।

যে কাগজের জন্যে এত কিছু করলেন, এতদিনের যা ধ্যানজ্ঞান তা উঠে গেলেও আপনার দুঃখ নেই !

দুঃখ আছে। কিন্তু তা মেনে নিতে হয়।—উমাপতি গভীর স্বরেই বলেছিল,—আমাদের এ কাগজ চিরদিন চলবার জন্যে নয়। এ কোন দলের কাগজ নয়, কোন স্বার্থ কি লাভের লোভ এর পেছনে নেই। কোথাও কোন ফাঁকির রফা দিয়ে এ কাগজ চালাবার চেষ্টায় গ্লানি ছাড়া আর কিছু মিলবে না। নিভবে জেনেই এ-দীপ জ্বেলেছিলাম। যদি কোথাও একটু আলো দিতে পেরে থাকে তাই যথেষ্ট।

জয়া তবু বুঝতে চায়নি। বলেছিল একটু কঠিনভাবেই,—আসলে আপনার ক্লান্তি এসেছে, নিজের ওপর বিশ্বাস আপনি হারিয়েছেন। এসব কথা শুধু নিজেকে আপনার স্তোক দেওয়া।

আঘাতটা অপ্রত্যাশিতভাবে রূঢ় সন্দেহ নেই। জয়া নিজেও বিস্মিত হয়েছিল নিজের আকস্মিক ধৃষ্টতায়।

সেই জন্যেই কি উমাপতি নীরবে কেমন একটা বিষণ্ণ কৌতুকের দৃষ্টিতে তার মুখের দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়েছিল ?

উমাপতির চোখে বিষণ্ণ কৌতুকের দৃষ্টি সেই বুঝি প্রথম দেখেছিল জয়া।

নিজের গ্লানির অস্বস্তিটা অস্বীকার করবার জন্যেই জয়া থামতে পারেনি। উমাপতির নীরবতার মর্যাদা না রেখে আবার প্রশ্ন তুলেছিল, কাগজ উঠে গেলে তার দেনা শোধের কি ব্যবস্থা হবে সেই সম্পর্কে। উমাপতি সে দেনা নিজেই শোধ করবে জানিয়েছিল শান্তভাবে। তাঁর বিপ্লবী জীবন ও দ্বীপান্তরের অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে দুটি বই তখন বাজারে খুব ভালোভাবে চলছে। তারই আয়ে সব দেনা শোধ করে দিতে পারবে বলেছিল।

দিয়েওছিল তাই শেষ পর্যন্ত।

কিন্তু সে পরের কথা।

বার

সেদিন জয়া নিজের ভেতরকার কি দুর্জ্ঞেয় ক্ষোভে জ্বালায় উমাপতির দেনা শোধ করবার আশ্বাসে পর্যন্ত ঈষৎ অবিশ্বাসের হাসি হেসে চলে আসতে দ্বিধা করেনি।

উমাপতিকে খুঁজতে যাওয়ার কথা সে জানায়নি ইচ্ছে করেই।

উমাপতি নিজেই জানতে পেরেছিল। বোধহয় সেই চাষী লোকটির কাছে। উমাপতির ছোটখাট ফায়-ফরমাজ খাটার কাজ সেই লোকটিই করে বলে জয়া পরে জেনেছিল।

উমাপতি একটা চিঠি লিখেছিল জয়াকে তার সেই আগের ঠিকানায়।

সে চিঠিটা কি এখনও আছে?

বোধহয় না। আগের বাড়ি ছেড়ে এখানে আসবার সময় অনেক কিছুই সে নির্মমভাবে নষ্ট করে ফেলেছিল—স্মৃতিকে যা কিছু চঞ্চল করে তুলতে পারে প্রায় সবই।

এ চিঠিটা কিন্তু থাকলে ভালো হত।

উমাপতির এই প্রথম চিঠি তার কাছে।

চিঠি না লিখে উমাপতি নিজেই যেতে পারত তার সেই আগের বাসায়। সে বাসা তার অচেনা নয়, কিন্তু উমাপতি না গিয়ে শুধু চিঠি পাঠিয়েছিল।

চিঠিটা নিজে যাওয়ার চেয়ে অনেক তাৎপর্যময় বলেই বোধহয়।

চিঠিতে যা লিখেছিল নিজে এলেও উমাপতি সে কথা সম্ভবত বলতে পারত না। পারলেও বলত না। যাকে স্বল্পবাক্ বলে উমাপতি তা নয়। তবে তার কথার উৎস সাধারণত রুদ্ধ হয়েই থাকে।

চিঠির ভাষা এতদিন বাদে সব মনে আছে কি ? না, তা নেই। তবে সুরটা আছে, আছে তার বিশেষ অপ্রত্যাশিত কাতরতাটুকু।—

জয়া, মনে মনে তো ভাবি কিছুই চাইব না। কিন্তু তবু অযাচিত-ভাবে যে এসেছিল তাকে কিছুক্ষণের জন্যে একান্তে পাওয়া থেকে ভাগ্যদোষে যে বঞ্চিত হয়েছি সে দুঃখে সবকিছু বিস্বাদ হয়ে যায় কেন ? তুমি যে সেদিন এসে আমায় না পেয়ে ফিরে গেছ সে কথা আমায় জানাওনি। রাগ করেই জানাওনি বলে ধরে নিচ্ছি, আর সেই রাগটুকুরই মনগড়া ব্যাখ্যা করে যেটুকু পারি সান্ত্বনা পাবার চেষ্টা করছি। কাগজ তো উঠে গেল। আমার দায়িত্বহীনতায় হতাশ ও বিরক্ত হয়ে হঠাৎ যে আবার একদিন আমায় খুঁজতে আসবে সে সম্ভাবনাও আর রইল না। আমার কাগজের বন্ধ্যা মরুতে তোমার অনেক শক্তি, সময়, উৎসাহ বৃথা অপব্যয় করিয়েছি। কাগজের ঋণ যেমন করে পারি শোধ করব, কিন্তু তোমার ঋণ—এইটুকু লিখেই থামলাম। ইচ্ছে করলে ও জায়গাটা কেটে দিতে পারতাম একেবারে পড়া না যায় এমনভাবে কালি দিয়ে জেবড়ে। কিন্তু লিখে যে ফেলেছি সে অন্যায়টুকু গোপন করবার চেষ্টা করব না। ঋণ বললে তুমি যা করেছ তাকে অনেক ছোট করা হয় আমি জানি। বিশ্বাস করো ঋণও যদি বলি, তবু পৃথিবীতে শুধু তোমার কাছে ঋণী হয়ে থাকতে আমার লজ্জা নেই। এ চিঠির সঙ্গে আমার চরিত্র যা বুঝেছ তার মিল যদি না পাও তাহলে আশ্চর্য হয়ো না। নিজেরাও নিজেদের কাছে কত দিকে অনাবিষ্কৃত আমরা নয় কি ?

আশ্চর্য, মনে করতে গিয়ে চিঠিটা তো প্রায় নির্ভুলভাবে মনে পড়ছে। চিঠির লেখাগুলো যেন চোখের সামনে স্পষ্ট ফুটে উঠছে। চিঠিটা কি এমনই গাঁথা হয়ে গেছে মনের মধ্যে ?

কি করেছিল সে চিঠি পেয়ে ?

কিছুই করেনি কয়েকদিন।

কাগজের অফিসে ক'দিন যেতে হয়েছিল অবশ্য তারপর। কাগজ

তুলে দেওয়ারও কিছু ঝামেলা আছে। এত ঘনিষ্ঠ সংস্রব একেবারে হঠাৎ ছিঁড়ে দিয়ে নিজের দায়িত্বটুকু এড়াতে চায়নি।

সেখানে অবশ্য উমাপতির সঙ্গে দেখা হয়েছে। আলাপ-আলোচনাও হয়েছে।

কিন্তু সে অন্য উমাপতি, অন্য জয়া।

যে উমাপতি ওই চিঠি লিখেছে আর যে জয়ার সে চিঠি পড়ে নিজের ঘরের নিভৃতে অন্তত খানিকক্ষণের জন্যে প্রায় অহেতুক অশ্রুতে চোখের দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে গেছে, তারা যেন সেখানে অনুপস্থিত।

কথায় তো নয়ই, কোন অসতর্কভঙ্গিতেও একবার সে প্রসঙ্গের ইঙ্গিত কেউ করেনি।

হিসেবপত্র চোকানো, বই-কাগজ আসবাব ইত্যাদির ব্যবস্থা করা এইসব স্থূল কাজ মোটামুটিভাবে সারা হয়েছে। তারপর পূর্ণচ্ছেদ টানা হয়েছে সব কিছুর ওপব।

অফিসঘর একেবারে খালি করে বাড়িওয়ালার হাতে ছেড়ে দিয়ে—সব শেষ করে আসার দিন সাধাবণভাবে দুজনের ছাড়াছাড়ি হলে কিছু পরস্পরকে নিশ্চয় তারা বলত, কিন্তু নেপথ্যে কোথায় একটা উদ্বেলতার আভাস আছে বলেই প্রকাশ্যে তারা নিতান্ত শুষ্ক নীরসভাবে কয়েকদিনের ঘটনাচক্রে মিলিত সহকর্মীর মত বিদায় নিয়েছে।

সেই বিদায় নেওয়াই যদি সত্য হত!

তা হল কই!

জয়া একদিন সেই কাদায় পিছল অপ্রশস্ত আলের পথে নিজেকে হাঁটতে দেখে নিজেই যেন অবাক হয়েছে।

এ যেন তার স্বেচ্ছায় সচেতন মনে আসা নয়।

অর্ধেক পথ গিয়েও মনে হয়েছে এখনও ফিরে গেলে পারে। কেউ তার এ আসার কথা জানতে পারবে না। তার এ অবাধ্য মনের ক্ষণিক দুর্বলতার সাক্ষী থাকবে সে শুধু নিজেই।

তবু ফিরতে পারেনি।

সেখানে পৌঁছে যা ভেবেছিল বা ভয় করেছিল তার কিছুই হয়নি কিন্তু।

উমাপতি সেদিন একা নয়। তার ছোট ঘর অন্য অতিথি-অভ্যাগতে প্রায় ভর্তি বলা চলে।

মান্যগণ্য দুজন সুপরিচিত রাজনীতির মানুষ তাঁদের এক একজন করে চেলা সঙ্গে নিয়ে এসেছেন। কাছাকাছি কোন আশ্রমের গৈরিকধারী একজন সন্ন্যাসীও পায়ের ধুলো দিয়েছেন। ঘরে তাঁদের বসবারই জায়গার অভাব।

জয়াকে দেখে রাজনীতির গণ্যমান্যেরা ভ্রুকুটিভরে তাকিয়েছিলেন। সন্ন্যাসীঠাকুরের মুখে স্মিত হাস্য দেখা গেছল, আর উমাপতি বেশ একটু উচ্ছ্বসিত আতিশয্যের সঙ্গে উঠে দাঁড়িয়ে তারই যেন অপেক্ষা করছিল এমনভাবে সাদর অভ্যর্থনা জানিয়েছিল।

এসো, এসো জয়া। আমি তো ভাবলাম তুমি আজ আর এলেই না।

প্রথমটা একটু বিমূঢ় হয়ে গেলেও জয়ার সামলে নিতে দেরী হয়নি। পাছে সে কোনরকম অপ্রস্তুত বোধ করে তার জন্যে উমাপতির ব্যাকুলতাজনিত অপলাপটুকুতেও সে কৃতজ্ঞ বোধ করেছিল।

তারপর সেদিন···

জয়ার স্মৃতিচারণে বাধা পড়ে। সিঁড়ি দিয়ে কে উঠে আসছে।

ছুটির দিনে এই অবেলায় কে তার কাছে আসতে পারে!

সিঁড়ির উপরে যে আসছে তাকে দেখা যাবার আগেই জয়া খানিকটা অনুমান করে নেয়। অনুমান তার ঠিক। তাদের স্কুলের একজন সহকর্মিনীই এসেছে তার সঙ্গে দেখা করতে। কেন যে এসেছে এবং আজ যে আসার সম্ভাবনা আছে, তা আগেই কিছুটা জানা ছিল। ভুলে গিয়েছিল নিজের মনের ভাবনায়।

মেয়েটির নাম সবিতা। বয়স খুব বেশী নয়। তার চেয়ে অনেক ছোট। বছর কয়েক হল তাদের স্কুলে কাজ করছে। মাস কয়েক ধরেই তার বিয়ের কথা নিয়ে শিক্ষয়িত্রীদের নিজেদের মধ্যে হাসিকৌতুক চলছিল। কিছুদিন আগে জানা গিয়েছে যে, তার বিয়ের তারিখ স্থির। ভালবাসার বিয়ে। বাড়ির মতের বিরুদ্ধে নিজেরাই উদ্যোগী হয়ে বিয়ে করছে। রেজিষ্ট্রি করে বিয়ে। শুধু অসবর্ণ বিয়ে বলে নয়, অন্য হাঙ্গামা বাঁচাবার জন্যে। বিয়েতে ছেলের দিক দিয়ে যদি বা কেউ আসে, সবিতার বাড়ি থেকে কেউ আসবে না। তার বাবা অত্যন্ত গোঁড়া সেকেলে। মেয়েকে লেখাপড়া শিখিয়েছেন এই পর্যন্ত। স্কুলে কাজ নেওয়াটা সমর্থন করেননি, শুধু বিয়ের ব্যবস্থা করে উঠতে পারেননি বলেই নিরুপায় হয়ে চুপ করে থেকেছেন। কিন্তু মেয়ে নিজের বিয়ে নিজেই স্থির করবার পর তার আর মুখদর্শন করবেন না বলে প্রতিজ্ঞা করেছেন।

সবিতা এখন মেয়েদের হোস্টেলেই আছে। সেখান থেকেই রেজিষ্ট্রি অফিস ও তারপর বাসার অভাবে স্বামীর সঙ্গে আপাতত এক হোটেলে গিয়ে থাকবে। বরপক্ষ কন্যাপক্ষের অভাবে স্কুলের সহকর্মিনীদেরই সহায় হয়ে দাঁড়াতে হবে।

সবিতা নিজেই নিমন্ত্রণ করতে এসেছে। সলজ্জভাবে একটা ছাপানো চিঠিও জয়ার হাতে দিয়ে বলে,—যেতে হবে কিন্তু জয়াদি!

নিশ্চয় যাবো।—জয়া আন্তরিক স্নেহের হাসি হাসে।

সবিতাকে সত্যিই যেন আজ অন্যরকম দেখাচ্ছে। দেখতে সে সত্যিই ভালো নয়। নেহাৎ সাদামাটা চেহারা। কিন্তু সেই চেহারাই কিসের একটা অপূর্ব আভায় রূপান্তরিত হয়ে গেছে।

এই তো জীবন, এই তো প্রেম, এই তো গল্প!

খুব সাধারণ মামুলি গল্পও নয়।

বৈচিত্র্য আছে, ব্যতিক্রম আছে, আছে বিদ্রোহ উত্তেজনার উপাদান।

এই দিয়েই তো পরম সন্তোষে নিজের জীবনের কি ছাপানো বইএর, সত্যিকার কি কাল্পনিক কাহিনী বুনে চলা যায়।

অল্পবিস্তর সবাই তো তাই করে।

শুধু নিয়তির চিহ্নিত দু'একজন কোন দুর্বোধ অভিশাপে কাহিনীর এই ছকের সঙ্গে নিজেদের মেলাতে পারে না কিছুতেই।

জয়ার কি সবিতাকে দেখে তার সৌভাগ্যে অস্ফুট একটু ঈর্ষা হয়? কিংবা করুণা?

না। ও সব কিছুই সত্যি নয়। যথার্থ একটি মমতাই জয়া অনুভব করে এই সহজ সরল স্বাভাবিক মেয়েটির জন্যে।

প্রার্থনার যদি কোন দাম থাকে তাহলে অন্তর থেকে প্রার্থনা করে সবিতা স্বামী নিয়ে সংসার নিয়ে সুখী হোক।

সুখ বলতে সবাই যা বোঝে সেই সুখ।

কি দরকার সুখের স্বরূপ তলিয়ে বোঝবার চেষ্টার, কি লাভ যেখানে যা মধুর যবনিকা ফেলা আছে তা সরিয়ে উঁকি দেবার ধৃষ্টতায়?

সবিতা নিজে থেকেই বিয়ের পর কি কি তাদেব আশা আকাঙ্ক্ষা পরিকল্পনা আছে বলে যায়। জয়ার সহানুভূতির উত্তাপই তাকে অলক্ষ্যে উৎসাহ দেয় নিশ্চয়।

জয়া আগ্রহের সঙ্গে প্রসন্ন মুখে শোনবাব চেষ্টা করে।

কিন্তু তবু মন তার কখন নিজের অজ্ঞাতেই এই বর্তমানকে ছাড়িয়ে চলে যায়।

তের

কফির পেয়ালায় চামচ নেড়ে চৌকো চিনির ডেলা দুটো গুলিয়ে নিতে নিতে এদিক ওদিক চেয়ে, বিপিন ঘোষ বেশ একটু ভারিক্কী চালেই বললে,—কতদিন বাদে এলাম, কিন্তু মনে হচ্ছে কিছুই যেন বদলায়নি। বারান্দার এই টবগুলোর ঠিক ওই ফুলগুলোই যেন দেখেছিলাম।

নীরজা দেবী রূপোর চিমটে দিয়ে বিপিন ঘোষের প্লেটে পেস্ট্রী তুলে দিতে দিতে একটু নীরবে হাসলেন মাত্র।

মনে মনে অবশ্য বললেন, তোমার অনেক বেয়াদবি সহ্য করতে আজ প্রস্তুত হয়ে আছি, সুতরাং বলে যাও বিপিন ঘোষ। কিন্তু ওপরের এই টেরেসে এসে বসে কফি খাবার সৌভাগ্য তোমার কোনদিন হয়নি। ওই বৈঠকখানা ঘরেই জোড়হস্ত হনুমানের মত বসে থাকতে। টেরেসে কোনদিন পদার্পণ করবার অধিকার পেয়েছিলে বলে তো মনে হয় না।

আমি কি ভাবছিলাম জানেন নীরজা দেবী!—বিপিন ঘোষ একটু থেমে নিজের ভাবনাটাকে গুরুত্ব দিয়ে নীরজা দেবীর দিকে তাকাল।

নীরজা দেবীও পেস্ট্রী দেওয়া প্লেটটা বিপিন ঘোষের দিকে এগিয়ে দিয়ে যথোচিত আগ্রহ দেখিয়ে চোখ তুললেন।

ভাবছিলাম,—বিপিন ঘোষ তার মূল্যবান ভাবনাটাকে প্রকাশ করল,—কিছু বদলালেই বরং আশ্চর্য হতাম। নিজেকে যেমন, নিজের চারপাশের সব কিছুকে তেমনি কোন আশ্চর্য আরকে অজর করে রাখবার কৌশল যে আপনার জানা! আপনার কিছুই বদলায় না।

বিপিন ঘোষ নিজের দামী কথাটা নিজেই হেসে উপভোগ করলে।

নীরজা দেবীও হাসলেন। হেসে যেন প্রশংসাটুকুতে কুণ্ঠিত হয়ে বললেন,—কিন্তু না বদলানো কি ভালো ? সময়কে যারা হার মানায় সময় তাদের ক্ষমা করে না বলেই শুনেছি। একদিন সুদে আসলে প্রতিশোধ নেয়।

বিপিন ঘোষের পক্ষে কথাগুলো একটু বেশী সূক্ষ্মতার দিকে চলে যাচ্ছে যেন। বিপিনের সেটা পছন্দ নয়।

সে একটু মোটা স্বরে নামিয়ে এনে বললে,—ভুল, নীরজা দেবী ভুল। সময় তো আর মানুষ নয় যে হার মেনে আক্রোশ পুষে রাখবে। তবে সে মানুষও তো দেখেছেন হারের খেলাও যে হাসিমুখে অম্লান বদনে খেলে চলে যায়। মনে কোনো জ্বালাই তার থাকে না।

যাক। বিপিন ঘোষ মনে মনে স্বস্তির নিশ্বাস ফেললে। কথাটাকে কোনরকমে ঠিক .অভিপ্রেত দিকে ঘোরানো গেছে। কী করে যথাস্থানে পৌঁছোবে তার জন্যে একটু ভাবনাই ছিল। ভয় হচ্ছিল এইসব সাজানো কথার মারপ্যাঁচের খেলা খেলতে গিয়ে আসল উদ্দেশ্যই না পিছিয়ে দিতে হয়। এখন অন্তত নাগালের মধ্যে লক্ষ্যটা এনে ফেলা গেছে।

নীরজা দেবী কিন্তু না বোঝার ভানই করলেন।

কা'র কথা বলছেন ?—নীরজা সত্যিই যেন বিস্মিত।

কা'র কথা বলছি আপনি জিজ্ঞাসা করছেন ?—বিপিন ঘোষ বেশ ক্ষুণ্ণ।

ওঃ উমাপতির কথা বলছেন !—নীরজা দেবী যেন এতক্ষণে ধরতে পারলেন,—সত্যিই আমি ভাবতে পারিনি। কারণ—কারণ তাঁকে ঠিক আমাদের মত মানুষের মাপ দিয়ে বিচার করার কথা মনেই আসে না। তাঁকে এসব প্রসঙ্গে বোধহয় না আনাই ভালো।

বিপিন ঘোষ একটু প্রমাদ গণল   এ সুরটাও তো সুবিধের নয়। কথার মোড় একেবারে অন্য দিকে ফিরে যাবে।

ব্যস্ত হয়ে বলল,—ঠিকই বলেছেন, কিন্তু তাঁর কথা আপনা থেকেই এসে যায় যে। আপনি তো জানেন, শেষ ক'টা বছর একে একে সবাই যখন তাঁকে ছেড়ে গেছে তখন প্রায় একা তাঁর পাশে থাকার সৌভাগ্য আমারই হয়েছে!

আর সেই সৌভাগ্য এখন কিভাবে তুমি ভাঙিয়ে নিতে চাইছ তা উমাপতি যদি জানতে পারতেন! নীরজা দেবী মনে মনেই বললেন।

মুখে বললেন,—হ্যাঁ, অন্তত আর কাউকে কাছে তিনি ডাকতে চাননি বলেই শুনেছি।

ডাকতে চাননি কেন তাও হয়ত জানেন!—বিপিন সুযোগটা চেপে ধরল,—ডাকবার মত মানুষ তিনি কাউকে দেখেননি। মানুষ সম্বন্ধেই তিনি হতাশ হয়ে গিয়েছিলেন। নিজে হাত বাড়িয়ে যাদের কাছে টেনেছিলেন তাদের কাছেই যে আঘাত তিনি পেয়েছিলেন তা কল্পনা করা যায় না।

আপনার সঙ্গে একমত হতে পারলাম না বিপিনবাবু!—নীরজা দেবী হেসে প্রতিবাদ জানালেন,—নিজের ব্যক্তিগত আঘাতটাই বড় করে দেখবেন এরকম মানুষ তিনি ছিলেন না বোধহয়। হতাশ তিনি যদি হয়ে থাকেন তার অন্য কারণ আছে। হয়ত তাঁর নিজের ভেতরেই অবসাদ এসেছিল। এ দেশের মানুষের নিজস্ব মানবিক মূল্য সম্বন্ধেই তাঁর সংশয় জেগেছিল।

অবসাদ এসেছিল সত্যিই, কিন্তু তা ওই যা বললেন, ওই সংশয়েরই প্রতিক্রিয়া। আর সে সংশয় তো কি বলে, হাওয়ায় ভাসা ভাবনা থেকে আসেনি। সামনে যাদের দেখেছেন, যাদের সংস্রবে এসেছেন তারাই ওই সংশয় তাঁর মনে জাগিয়েছে।

বিপিন ঘোষ বেশ একটু পরিতৃপ্তভাবেই থামল। এইবার আসল তীরটা নিক্ষেপ করা যাবে।

কিন্তু তাকে একেবারে বিস্মিত দিশাহারা করে নীরজা দেবী বললেন,—আপনি তাঁর শেষ জীবনের বিষয়ে একটা বই তো তাহলে লিখলে পারেন বিপিনবাবু! যা আর কেউ জানে না এমন অনেক উপাদান নিশ্চয়ই আপনার হাতে আছে। অনেক গুপ্ত তথ্য আপনি দিতে পারেন, খুলে দিতে পারবেন অনেকের মুখোস!

এরকম বই আপনি লিখতে বলেন!—বিপিন বিমূঢ়ভাবে শুধু বলতে পারল।

বলব না কেন? উমাপতি বেঁচে থেকে যা করতে চেয়েছিলেন তার কিছুই করে উঠতে পারেননি সম্পূর্ণভাবে। তাঁর মৃত্যুতে তবু একটা বড় কাজ হোক। অন্তত একটু সাড়া তো পড়বে। দু'চারটে বড় বড় ফোঁপরা গাছের শেকড়ও উপড়ে যদি বা না যায়, নড়বে নিশ্চয়ই।

বিপিন ঘোষের সবকিছু গুলিয়ে গেছে। হাতের কেকটা অনেকক্ষণ ধরে হাতেই ধরা আছে। প্লেটে সেটা নামিয়ে রাখতেও ভুলে গেল।

সমস্ত ব্যাপারটা বানচাল হয়ে যাচ্ছে সে বুঝতে পারছে। যেমন করে হোক সামলানো এখন দরকার।

নীরজা দেবী কফির পটটা তুলে স্বাভাবিক সহজ কণ্ঠে বললেন, —আপনাকে আর একটু কফি দিই! ওকি, আপনার পেয়ালা তো প্রায় ভর্তিই রয়েছে। ভালো লাগছে না?

না, না খুব ভালো লাগছে!—বিপিন পেয়ালায় চুমুক দিলে বুদ্ধিটা স্থির করবার সময় নেবার জন্যেও।

ওরকম বই যদি একটা লেখেন,—নীরজা দেবী যেন অত্যন্ত হাল্কাভাবেই প্রসঙ্গটায় ফিরে গেলেন,—তাহলে আমিও আপনাকে কিছু মশলা দিতে পারব বোধহয়।

আপনি দিতে পারবেন!—বিপিনের বিস্ময়টা যথার্থ।

হ্যাঁ, সেদিন পুরনো সব কাগজপত্রগুলো ঘাঁটছিলাম, জঞ্জাল কিছু

সাফ করে ফেলবার জন্যে। উমাপতিরও ক'টা চিঠি তার মধ্যে পেয়ে গেলাম। উমাপতির সবই একটু খাপছাড়া তা তো জানেনই। দিনের পর দিন মৌনী হয়েই কাটাতেন, আবার কথা যখন বলতেন তখন যেন তুফান উঠত। চিঠির বেলায়ও তেমনি। কত লোক কত দরকারী চিঠি লিখে একছত্র উত্তর পায়নি, কিন্তু এক এক সময়ে এমন চিঠি লিখতেন যে মহাভারত হার মেনে যায়। একটা চিঠি ছাপিয়েই একটা বই হয়।

বিপিন ঘোষ অধৈর্যটা প্রকাশ না করে পারল না,—সে রকম চিঠি আপনার কাছে আছে ?

আছে বই কি ! তাঁর চিঠি লেখার কোন পাত্রাপাত্র ঠিক ছিল না, নিশ্চয় লক্ষ্য করেছেন। কোন উত্তরের তাগিদেও সে চিঠি লিখতেন না। ওই সময়টায় অন্তত দেখেছি, মনে হঠাৎ ঝড় উঠলে সেটা চিঠির ভেতরেই বইয়ে দিতেন। সে চিঠি লেখাটাই আসল, কা'কে কখন পাঠাবেন সেটা অবান্তর।

ওরকম চিঠি ক'টা আপনার কাছে আছে ?—বিপিনকে জিজ্ঞাসা করতে হল উচ্ছ্বসিত বিবরণ থামাবার জন্যেই।

তা বেশ কয়েকটা আছে। আমি তো একবার ভেবেছিলাম পুড়িয়েই ফেলে দিই। কী হবে আর ওসব চিঠি রেখে ! কি মনে করে তবু শেষ পর্যন্ত রেখেই দিয়েছি। এখন তো মনে হচ্ছে ভালোই করেছি। আপনি যদি সত্যিই এরকম বই একটা লেখেন কাজে লাগবে। মজার কথা কি জানেন, আপনার সম্বন্ধেও সে সব চিঠিতে অনেক কথা আছে।

আমার সম্বন্ধে !—বিপিনের গলাটা যেন ধরে গেছে।

হ্যাঁ, আপনি তো তখন সবে ওঁর কাছে আসতে শুরু করেছেন। এমনি কথায় কথায় আপনার কথা এসে পড়েছে আর কি ? না, আপনি কফিটা মুখেই তুলছেন না। ঠাণ্ডা হয়ে গেল যে !—নীরজা দেবী অতিথির আপ্যায়নেই ব্যস্ত হয়ে উঠলেন।

অতিথি কিন্তু কেমন গুম হয়েই বসে রইল। কফির পেয়ালা ঠাণ্ডা হওয়া সম্বন্ধে একটা ভদ্রতার জবাবও তার তৎক্ষণাৎ অন্তত মুখে যোগালো না।

নীরজা দেবীই আবার জিজ্ঞাসা করলেন,—আপনাকে একটা নতুন পেয়ালায় কফি দিই, কেমন ?

না থাক।—বিপিন এবার একটু হাসতে পারল,—আমি একটু ঠাণ্ডা করেই খাই।

কফির পেয়ালাটায় মুখরক্ষার খাতিরে দুটো চুমুক দিয়ে সে বললে, —আজ কিন্তু আমায় উঠতে হবে নীরজা দেবী। আপনার এই নিমন্ত্রণের জন্যে ধন্যবাদ।

কিন্তু নিমন্ত্রণের মান রাখলেন না যে!—নীরজা দেবী যেন দুঃখিত,—খাবার জিনিসে হাতই প্রায় দিলেন না, কফিও তো ছুঁলেন না বললেই হয়। আপনি চায়ের চেয়ে কফি যেন পছন্দ করতেন মনে পড়ল বলে এ ব্যবস্থা করলাম।

খাওয়া কিছু নয়। আপনি যে আমার পছন্দটা মনে রেখেছেন তার জন্যেই কৃতজ্ঞ!

বিপিন ঘোষ উঠে দাঁড়াল টেবিল ছেড়ে।

নীরজা দেবীও উঠে দাঁড়িয়ে কৃতজ্ঞতাটা বিনা প্রতিবাদেই গ্রহণ করে বললেন,— গাড়ি নিচেই আছে। ড্রাইভার যেখানে যেতে চান পৌঁছে দিয়ে আসবে।

আপনার অনেক অনুগ্রহ।—বলে বিপিন এগিয়ে গেল। কিন্তু নীরজা দেবীর কথায় আবার তাকে ফিরে দাঁড়াতে হল।

ওই দেখুন, একটা কথা ভুলেই যাচ্ছিলাম বলতে।—নীরজা দেবীর হঠাৎ যেন কথাটা স্মরণ হয়েছে এমনিভাবে বললেন,—আমার কাছে দামী হতে পারে এমন কি দু'একটা জিনিস আমায় ফেরত দেবার কথা লিখেছিলেন না! ভেবে দেখলাম ও আর আপনার ফেরত দেবার দরকার নেই। ওসব আপনার কাছেই

থাক। দামী সব কিছুর লোভ ধীরে ধীরে জয় করবার চেষ্টা করছি।

নীরজা দেবী মধুরভাবে হাসলেন।

সে আপনার যেমন ইচ্ছে!—চেষ্টা করেও স্বরটা যতখানি উচিত সহজ করে বিপিন রাখতে পারল না।

দাঁতে প্রায় দাঁত চেপে সিঁড়ি দিয়ে নেমে গিয়ে সে গাড়িতে গিয়ে উঠল।

সেখানে খাতিরের কোন ত্রুটি নেই।

ড্রাইভার সসম্মানে দরজা খুলে দাঁড়িয়েছিল তাকে নামতে দেখেই। ভেতরে গিয়ে বসবার পর দরজা বন্ধ করে ড্রাইভারের সীটে গিয়ে বসে সে সসম্ভ্রমে জিজ্ঞাসা করলে,—কঁহা চলে সাব?

জাহান্নামে! বলতে পারলে বিপিনের গায়ের জ্বালা কিছু মিটত।

নিজেকে সংযত করে সে একটা ঠিকানা বললে।

তার নিজের আস্তানার নয়, নিশীথ পাত্রের বাড়ির।

নিশীথ পাত্রের কাছে যাওয়ার কথা আগের মুহূর্তেও ভাবেনি। কেন যে হঠাৎ মনে হল নিজেই জানে না।

নিশীথ পাত্রের বাড়ি এখান থেকে অনেক দূর। যেতে যেতে নিজের ভাবনাগুলো গুছোবার অনেকখানি সময় পাওয়া যাবে বলেই হয়ত। কিংবা নিজেরও অগোচর আর কোনও দুর্জ্ঞেয় কারণ হয়ত আছে।

গাড়িতে হেলান দিয়ে বসে ভাবতে ভাবতে বিপিনকে স্বীকার করতেই হয় নিজের কাছে যে, হিসেবে সে বড় রকমের ভুল করেছে। ছুঁচ বেচতে যেখানে এসেছিল নিজের বুদ্ধিমত্তার দম্ভে, সে হাটকে তাচ্ছিল্যই করেছে একটু বেশী।

কমলদ' আজ মজে এসেছে বটে, কিন্তু তাকে হেলাভরে মাড়িয়ে যাওয়া যায় না। তার নরম কাদাও চোরাবালির মত চমকে দিতে পারে গোপন অতর্কিত টানে।

কমলদ'র বড় তরফের ভূতপূর্ব রাজবধূর জীবনে অনেক ঠিকে ভুল হয়েছে, কিন্তু দরকার হলে কমলদ'র প্রতাপের দিনের শক্তি না হোক, সমস্ত কূট কৌশল প্রয়োগ করতে যে তিনি পারেন এটুকু অনুমান করা উচিত ছিল।

নীরজা দেবী তার অস্ত্রই তাকে ফিরিয়ে দিয়েছেন।

আজ তার পরাজয়।

কিন্তু এ তো প্রথম খেলার চক্কর মাত্র। তাকে ভিন্নভাবে ঘুঁটি সাজাতে হবে।

এক হিসেবে এ মারটা খাওয়ারও প্রয়োজন ছিল। নীরজা দেবীর বেলা তো বটেই। অন্যের বেলাতেও সে সাবধান হতে শিখলে।

নীরজা দেবীর কাছে উমাপতির কোন চিঠি থাকাই 'একবার অবিশ্বাস্য মনে হয়েছিল। তারপর মনে পড়েছিল যে থাকা সম্ভব। সে যখন উমাপতির কাছে আসতে শুরু করেছে, নীরজা দেবী তখন উমাপতিকে প্রায় আগলে আছেন বললেই হয়।

উমাপতির চিঠিতে তার সম্বন্ধে কিছু উল্লেখ থাকাও বিচিত্র নয়। সে উল্লেখ ঘটা করে লোককে জানাবার মত না হওয়াই সম্ভব।

উমাপতি কি লিখেছেন তাও বুঝি সে জানে।

উমাপতি তাকে নিজেই সে কথা বলতে দ্বিধা করেননি। অন্য কারুর সামনে কিন্তু কখনও বলেননি। সেইটুকুই তাঁর ভালোবাসা।

চৌদ্দ

হ্যাঁ, উমাপতির ভালোবাসাই বিপিন ঘোষ পেয়েছিল বই কি। অহৈতুক অনার্জিত ভালোবাসা। নইলে এতদিন টিঁকে থাকতে পারত কি করে?

সে নিজেও কি শ্রদ্ধা করেনি, ভালোবাসেনি উমাপতিকে! উমাপতির সংস্রবে প্রথম যখন এসেছিল তখন তার শ্রদ্ধাভক্তি ভালবাসাতে কোন খাদ ছিল বলে তো তার মনে হয় না। জীবনে কারুর সম্বন্ধে যদি তার সত্যকার শ্রদ্ধাবিহ্বল আনুগত্য জেগে থাকে তাহলে উমাপতিই তা জাগিয়েছিলেন।

উমাপতি কিন্তু তখনই তাকে বলতেন,—তুই একটা ভণ্ড, বিপিন। নিজের ভণ্ডামিও সব সময়ে বুঝতে পারিস না, এইটুকুই তোর গুণ।

কখনও বলতেন,—আমি যদি কোন মেসায়া হতাম তাহলে তুই হতিস ইস্কেরিয়ট। তোর বিশ্বাসঘাতকতার ভেতর দিয়েই আমি নিজে ত্রাণ পেতাম, অমরও হয়ে যেতাম।

রসিকতা করতেন কখনও,—তুই এসে ছিনেজোঁকের মত লাগবার পর থেকে কেমন সন্দেহ হচ্ছে, আমিও একটা হয়ত ঈশ্বরপ্রেরিত কেওকেটা। যীশুদের কাছেই জুডাসরা এসে জোটে। জুডাস না হলে যীশু ব্যর্থ।

আর এমন দিনও গেছে যেদিন তিক্ত বিষণ্ণ স্বরে বলেছেন,—সকলে আমায় ছাড়বে, তুই শুধু ছাড়বি না। সকলকে আমি দূরে সরিয়ে দিতে পারব, শুধু তোকে পারব না, এ আমার কি অভিশাপ!

বিপিন বলতে পারত, অভিশাপ তো তারও। তারও অভিশপ্ত নিয়তি। না, নিয়তিকেই বা দোষ দেবে কেন? তারই ভেতরকার

এক তুর্বোধ তুর্বলতা তাকে বেঁধে বেখেছে। চরিত্রে হয়ত সে সত্যিই মূষিক, কিন্তু জাহাজ ডুবছে জেনেও ছেড়ে পালাতে পেরেছে কই ?

অথচ কি আশা স্বপ্ন মুগ্ধতা নিয়েই এসেছিল !

সে নিজেও এমন একটা কিছু আজেবাজে হেলাফেলা করবার মত মানুষ তখনই তো নয়।

ছোট বড় বাজনৈতিক দলেব ইত্যাদিব মধ্যে জায়গা পেয়ে যারা ফায় ফরমাজ খেটে ধন্য হয় তাব গোত্র তাদের থেকে আলাদা।

বিশ্ববিদ্যালয়ের বাজটীকা তখনই তার কপালে আটা, সরকারী চাকরির উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ তার জন্যে অপেক্ষমান বলে শত্রু-মিত্র সকলেবই স্থির ধারণা।

বিপিন ঘোষ সেই যৌবনেব দিনে অন্তত সে সুলভ সাফল্যের পথ ঘৃণাভরে বর্জন কবেছে।

করেছে তার অহমিকাতেই অবশ্য।

তার যে সব সতীর্থ সহপাঠী বিদ্যাবুদ্ধি ও স্বাভাবিক প্রতিভায় তার ধারে কাছে পৌছোয় না, তারাও হাঁসফাঁস করে বিলেতে ঘুরে পরীক্ষা দিয়ে এসে হয়ত দেশী মানুষের তখনকার দিনের জীবন-সার্থক করা সম্মান রাজভৃত্য হবার সৌভাগ্য লাভ করবে। ওদের সঙ্গে এক মাপের এক গোয়ালের গরু হওয়ায় তার তৃপ্তি নেই।

সে যথার্থ দরিদ্র পরিবারের ছেলে। শুধু নিজের ক্ষমতায় সবচেয়ে সেরা সব বৃত্তি আদায় করতে করতে বিশ্ববিদ্যালয়ের সব ক'টা ধাপ আর সকলকে পিছনে ফেলে অনায়াসে পার হয়েছে। বিলেত যাবার মত সংস্থান তার ছিল না, কিন্তু ইচ্ছে করলে তাও সংগ্রহ করতে কি আর সে পারত না ! তা সে করবার চেষ্টাও করেনি। সত্যিকার কুঁড়ে ঘর থেকে সে বেরিয়েছে, একতলা কোঠা পেয়েই সে খুশী হয়ে বিছানা পাতবে না।

ইচ্ছে করলে তখনকার দিনের বড় রাজনৈতিক দলেই সে থাকতে পারত। কিছুদিন আসা যাওয়াও করেছে। কিন্তু তার মন ওঠেনি।

প্রথমত সেখানে ভীড় বড় বেশী, দ্বিতীয়ত তার কেমন করে বলা যায় না ধারণা হয়েছিল যে মামুলি দলাদলির দিন ফুরিয়েছে, এবার আসছে ব্যক্তিত্বের অভ্যুদয়ের যুগ।

তিনি আসবেন দেখবেন জয় করবেন।

দিগন্তে তাঁর জন্যে উৎসুক চোখ মেলে রাখতে হবে।

এইখানেই তার গণনার মস্ত ভুল।

কিন্তু তখন যৌবনের উদ্ধত আত্মবিশ্বাসে মনে হয়েছিল, দেশের ও নিজের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ তার নখদর্পণে।

উমাপতির সঙ্গে পরিচয় হবার পর নিজের গণনার অভ্রান্ততা সম্বন্ধে আর কোন সংশয়ই ছিল না তার মনে। আগামী কালের বিজয় মুকুট যেন তাঁর মাথায় মনশ্চক্ষে দেখতে পেয়েছিল।

আশ্চর্যের কথা এই যে উমাপতির সঙ্গে তার পরিচয় হয়েছিল নির্বাচন সংগ্রাম থেকে উমাপতি যখন সরে দাঁড়ান তার সামান্য কিছুকাল আগে।

উমাপতি কয়েকদিন বাদেই নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়ান।

তখন তাঁকে পরাজিত অপদস্থই বলা চলে।

কিন্তু সূর্যও তো রাহুগ্রস্ত হয়।

সেই পরাজয়ের অন্ধকারেই উজ্জ্বল অরুণোদয়ের আভাস সে দেখতে পেয়েছিল এও ছিল তার গর্ব।

কিন্তু তারপর? তারপর ধীরে ধীরে এক-একটি করে ভ্রান্তি তো তার কেটে গেছে, প্রতি পদে নিজের গণনার ভুল, বিচারের ত্রুটি সে তো বুঝতে পেরেছে!

তবু সে সরে যেতে পারেনি কেন?

আশার ছলনায় তখনও সে প্রতারিত বলে?

না, তা নয়। উমাপতিকে সে তখন ভালো করেই চিনেছে। কোথাও কোন বিরাট অভিযানের পুরোভাগে তাঁকে যে আর দেখা যাবে না সে তখন জানে। জানে যে উমাপতি একটা বিলীয়মান নাম।

তাহলে কি অভ্যাসের জড়তায় ও আলস্যে সে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করতে পারেনি ?

তাই বা কি করে বলবে !

ছেড়ে যাবার কথা আর সে ভাবেওনি। কাছে থেকে আনুগত্যের পবিত্র মর্যাদা অনেক সময়েই রাখতে অবশ্য পারেনি, স্বার্থসিদ্ধির সুযোগ ওরই ভেতর নিতে গিয়ে ধরা পড়ে তীব্রভাবে তিরস্কৃত হয়েছে।

তবু সেও যেমন ছাড়তে চায়নি, উমাপতিও তেমনি পারেননি তাকে বিদায় করতে।

উমাপতির এ অদ্ভুত দুর্বলতার কোন অর্থ খুঁজে পাওয়া যায় না। এও তাঁর শেষ জীবনের আত্মপীড়নের একটা পদ্ধতি, এইটুকু শুধু কল্পনা করে নেওয়া যায় বটে। নিজেকে লোকচক্ষে হেয় করে তোলাও যাঁর একটা কৌতুক মনে হয়েছিল, বিপিন ঘোষের সান্নিধ্য সহ্য করাও তেমনি তাঁর অস্বাভাবিক যন্ত্রণাবিলাস হয়ত।

বিপিন ঘোষ নিজে এ ব্যাখ্যায় বিশ্বাস করে না।

তার কুটিল ও কপট মন ও ভাবাবেগের কুজ্ঝটিকাহীন তীক্ষ্ণ বুদ্ধি দিয়েই সে বোঝে এ বিচিত্র মনোভাব ওরকম মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যারও বাইরে।

উমাপতির মত মানুষের ওইখানেই বিশেষত্ব। ধর্মন্যায় নীতিতে যাকে বর্জন করার সুস্পষ্ট নির্দেশ, তাকেও অকাতরে আশ্রয় না দিলে নিজের কাছে তাঁরা ছোট হয়ে যান।

উমাপতি ঘোষাল যীশু অবশ্য নন, কিন্তু সেই বা আদর্শ জুডাস হতে পারল কই !

ছোটখাট অসাধুতা ও কপট স্বার্থসিদ্ধি পর্যন্তই তো তার দৌড়। চরম বিশ্বাসঘাতকতায় নিজেকে চির অভিশপ্ত নরকস্থ করে উমাপতিকে আরেক মহিমায় মণ্ডিত করতেও তো সে পারত !

কেনই বা তা পারেনি ?

না পারাটাও তার মনে ক্ষোভ হয়ে মাঝে মাঝে জাগে কেন ?

কুটিল স্বার্থসর্বস্ব একান্ত বাস্তবনিষ্ঠ বিপিন ঘোষও এসব প্রশ্নে মাঝে মাঝে জর্জর হয়।

পনর

রামবাবু আবার অসীম রাহাকে ডেকেছেন। অফিসে নয়, ছুটির দিনে তাঁর বাড়িতে।

রামবাবুর ছুটি বলে অবশ্য কিছু নেই। হপ্তায় একটা দিন শুধু অফিসে নিজের কামরায় গিয়ে বড় একটা বসেন না এই পর্যন্ত। কাগজ তো বার হয় প্রতিদিনই। রামবাবুর কাজের তাই কামাই নেই। অফিসে যেদিন না যান বাড়িটাই সেদিন অফিস হয়। অফিসেব লোকেদের ডাক পড়লে হাজিবা দিতে হয় সেখানে। ফোনে আদেশ নির্দেশ চলে সারাক্ষণই।

এখনও রামবাবু ফোন ধবে বসে আছেন তাঁর ছোট্ট ঘরটিতে।

অসীম অপেক্ষা করে বসে আছে কাছেই একটি ভাঙা বেতের চেয়ারে তাঁর ফোনের আলাপ শেষ হবাব জন্যে।

অফিস থেকে কেউ একটা জরুরী বিবরণ পড়ে শোনাচ্ছে। রামবাবুর সাইক্লপিয়নের হাতে বিবরণটা পাবার জন্যে অপেক্ষা করবার ধৈর্য নেই। ফোনেই শুনে নিচ্ছেন মাঝে মাঝে হুঁ হাঁ দিয়ে।

পড়ে শোনাচ্ছেন নিশ্চয় বিশ্বনাথবাবু। পদমর্যাদায় রামবাবুর পরেই তাঁর স্থান, কিন্তু স্বাধীন ভাবে কোন কিছু রামবাবুর অনুপস্থিতিতেও তাঁর করার সাহস নেই। রামবাবুর ভয়ে নয়। কারণ রামবাবু জবরদস্ত নন মোটেই। তাঁর অনুমোদন ছাড়া কোন কিছু হবে না এমন লিখিত অলিখিত কোন নির্দেশও তাঁর নেই। তবু তাঁর সঙ্গে পরামর্শ করবার সুযোগ থাকলে তাঁকে বাদ দিয়ে কিছু করা অফিসের সকলেরই প্রায় কল্পনাতীত। তাঁর ওপর নির্ভর করাটা সহকর্মীদের প্রায় মজ্জাগত হয়ে গেছে।

রামবাবু পারেনও বটে সমস্ত ঝক্কি মাথায় নিতে। কাজ ছাড়া

আর কোন চিন্তা নেই। এককালে দেশের কাজ করেছেন, জেল খেটেছেন। এখন খবরের কাগজই ধ্যানজ্ঞান। ছেলেপুলে পুষ্যি ইত্যাদি নিয়ে বেশ বড় সংসার। কিন্তু সে সংসারে তিনিই যেন বাইরের লোক। এই ঘরটি আর অফিসটি শুধু চেনেন।

এই রামবাবুই কিন্তু উমাপতি ঘোষালের জীবনের লুপ্ত বিস্মৃত সমস্ত বিবরণ উদ্ধার করবার জন্যে ব্যাকুল।

তাও খবরের কাগজের প্রয়োজনে নয়।

এ তথ্যটা অসীম রাহা খুব সম্প্রতি আবিষ্কার করেছে। আবিষ্কার করেছে খাজাঞ্চীবাবুর সঙ্গে এমনি সাধারণ আলাপের মধ্যে।

ভাউচার সই করে আগেকার কিছু রাহা খরচা আদায় করতে গেছল। কথায় কথায় বলেছে, বড় বিলটা কিন্তু শীগগিরই পাচ্ছেন।

খাজাঞ্চীবাবু অবাক হয়ে বলেছেন, আপনার আবার বড় বিল কিসের?

ওই যেটার আগাম নেওয়া আছে!—অসীম সন্দিগ্ধ হয়েই বোঝাতে চেষ্টা করেছে।

বুঝতে পারলাম না তো!—খাজাঞ্চীবাবু অন্য কাজে মন দিয়েছেন।

অসীমও আর কিছু ভাঙেনি।

যে সন্দেহটা তার গোড়া থেকেই হয়েছিল, সেটা দৃঢ় হয়েছে এইবারে।

রামবাবু তাকে ইতিমধ্যে খরচপত্র হিসেবে যা দিয়েছেন তা তাহলে নিজে থেকেই!

রামবাবুর এ অনাবশ্যক কৌতূহল কেন যার জন্যে নিজে থেকে খরচা করতে তিনি প্রস্তুত?

আজকে ছুটির দিনে বাড়িতে ডেকে পাঠানোর মধ্যেও অসীম রামবাবুর আগ্রহের তীব্রতা খানিকটা অনুমান করতে পেরেছে। অফিসের কাজে তার মত রিপোর্টারকে বাড়িতে ডাকবার কথা নয়।

রামবাবুর ফোনের কাজ এতক্ষণে শেষ হল। জরুরী বিবরণটা

সম্বন্ধে কয়েকটা নির্দেশ দিয়ে ফোন নামিয়ে তিনি অসীমের দিকে ফিরলেন।

ফিরেও কিছুক্ষণ তার দিকে সোজা না তাকিয়ে কি ভাবতে ভাবতে যেন অন্যমনস্ক হয়ে রইলেন।

ভাবলেশহীন মুখ। কিছু বোঝবার জো নেই ভালো কথা বলবেন, না মন্দ!

অসীমের কিন্তু মনে হল যে ওই মুখোশের মত মুখের আড়ালেও কিছু একটা দ্বিধার দোলা চলছে। সেটা কি তাকে এখানে ডাকার জন্যে? কাগজের কাজে ছাড়া অফিসের সংস্রব তিনি রাখেন না বলেই জানে। নিজের ব্যক্তিগত প্রয়োজনের জন্যে কারুর বিন্দুমাত্র সাহায্য নেওয়া তাঁর স্বভাববিরুদ্ধ। নিজের পদমর্যাদার নির্দোষ কোন সুবিধাও তিনি অধীনস্থ কারুর কাছে নেন না। আজকে তাকে যে ডেকেছেন তার মধ্যে ব্যক্তিগত কিছু স্বার্থ আছে বলেই কি এই দ্বিধা?

উমাপতি ঘোষালের জীবনরহস্য সন্ধানে তাঁর ব্যক্তিগত স্বার্থ কেন থাকবে?

রামবাবুর চোখের দৃষ্টিটা অসীমের ওপর স্থির হল। বললেন,—তুমি ছুটির দরখাস্ত করেছ দেখলাম।

হ্যাঁ, ছুটি অনেকদিন নিইনি। তা ছাড়া যে কাজটা দিয়েছেন সেটা যত সহজ হবে ভেবেছিলাম তত নয়। কিছুদিন আর সবকিছু ফেলে লেগে থাকা দরকার মনে হচ্ছে।

রামবাবু এ বিষয়ে কোন মন্তব্য না করে হঠাৎ অপ্রত্যাশিত প্রশ্ন করলেন,—কাজটায় কি কোন উৎসাহ পাচ্ছ না?

অসীম একটু চুপ করে রইল। ক'দিন আগে হলে বলত,—বিশেষ কিছু না। কিন্তু এখন তা আর সত্যি বলতে পারে না। তবু একটু রেখে ঢেকেই বললে,—না, খারাপ লাগছে না। তবে এ যেন প্রায় প্রত্নতত্ত্বের কাজ। অনেক কিছু মাটি থেকে খুঁড়ে বার করে পাঠোদ্ধার করতে হবে।

এইটুকু বলে অসীম আবার চুপ করল। শেষকালে বলতে চেয়েছিল,—কিন্তু করে লাভ কি?

রামবাবু নিজেই তার অনুচ্চারিত প্রশ্নের জবাব দিলেন,—এ কাজে নামও কিছু পাবে না, আর্থিক কোন সুবিধেও। তবু এ বেগারের কাজ কাউকে না কাউকে করতে হয়।

অফিসের রামবাবু আর নিজের বাড়ির এই ছোট ঘরটির রামবাবু এক, একথাটা তাহলে সম্পূর্ণ সত্য নয়! অফিসের রামবাবুর মুখে এ ধরনের কথা কেউ শুনেছে বলে মনে হয় না।

রামবাবু পরের কথাগুলিতে তাকে আরো বিস্মিত করে দিলেন। ধীরে ধীরে যেন নিজের মনেই সামনের জানলাটার দিকে চেয়ে বললেন,—ঘটা করে লেখবার মত অনেক জীবন আছে। তাদের সরকারী জীবনী লেখবার লোকও। উমাপতি ঘোষালকে নিয়ে লেখবার তারা কোন উৎসাহ পাবে না। তার সাফল্যের সিঁড়ি তো ওপর দিকে উঠে যায়নি, নিচের দিকে ব্যর্থতাতেই নেমে গেছে। তার বিস্তারিত জীবনীও আমি তোমার কাছে চাইছি না। চাইছি তার ব্যর্থতার রহস্য তোমায় দিয়ে খোঁজ করাতে। এ সন্ধান তোমায় নাম বা অর্থ না দিক, একেবারে নিষ্ফল হয়ত হবে না।

সেই ভাবলেশহীন মুখ, নিরুত্তাপ কণ্ঠ। কিন্তু এ সম্পূর্ণ অন্য রামবাবু। কাগজে খবর সাজানোর বিশেষত্ব ও বৈচিত্র্যই যার ইষ্টমন্ত্র সে রামবাবুর মুখোশের পেছনে এই মানুষটা লুকিয়ে আছে কে ভাবতে পেরেছিল!

অসীম অভিভূত হয়েই কিছু বলতে পারলে না।

রামবাবুই একটু থেমে তাঁর কথা শেষ করলেন,—আমাদের কাগজের কাজ যে এটা নয় তা তুমি নিশ্চয়ই বুঝেছ। সত্যি যদি ভালো না লাগে তাহলে ছেড়ে দিতে পারো। তবে তুমিই এ ভার নেওয়ার উপযুক্ত বলে আমার মনে হয়েছে।

তার প্রতি এ বিশ্বাসে কৃতজ্ঞতা জানানোই ভদ্রতাসঙ্গত ছিল।

কিন্তু সম্পর্কটা এখন অধীন ও প্রধানের কৃত্রিম শিষ্টাচারেব ওপরে উঠেছে বিশ্বাস কবেই অসীম প্রশ্ন করতে পাবলো,—কেন ?

রামবাবুব নতুন পরিচয় পেয়ে এতক্ষণ কমবেশী বিস্মিতই হয়েছে, এবার তাঁর উত্তরটা তাকে স্তম্ভিত কবে দিলে।

তুমিও স্বধর্মভ্রষ্ট বলে। স্বধম ত্যাগ করেও তুমি ভেতরের ক্ষোভ একেবারে মুছে ফেলতে পারোনি বলে। কবি হতে চাওয়ার যন্ত্রণা তুমি একেবারে ভোলনি বলে।

মুখের ভাবে কোন পরিবর্তন নেই, যান্ত্রিক কণ্ঠস্বরেরও। কিন্তু কি গাঢ় উত্তাপ কথাগুলোর মধ্যে !

স্তব্ধ হয়ে অসীম খানিকক্ষণ বসে রইল।

তারপব শান্তভাবে বললে,—একটা কথা না জিজ্ঞেস করে পারছি না। আপনার উমাপতি সম্বন্ধে এ আগ্রহ কেন ?

রামবাবু এ প্রশ্নটা ধৃষ্টতাও মনে করতে পারতেন। কিন্তু তাঁর উত্তর শুনে তা মনে হল না।

স্বাভাবিক গম্ভীর স্বরেই বললেন,—জবাবটা এখন দিলাম না। তোমার সন্ধান চালিয়ে যাও। নিজেই হয়ত কিছুটা জানতে পারবে !

রামবাবু আবার ফোন তুলে নিয়ে নম্বর ঘোরাতে শুরু করলেন।

এখন বসে থাকা না থাকা অসীমের ইচ্ছে।

অসীম নমস্কার জানিয়ে উঠেই গেল।

ষোল

জয়া বাস থেকে নামল।

মনে হল ঠিক জায়গাতেই নেমেছে।

কম দিনের কথা তো নয়।

স্মৃতির রহস্য বড় দুর্বোধ। অতি তুচ্ছ খুঁটিনাটি নির্ভুলভাবে তা ধরে রাখে, আবার অতি মূল্যবান স্থান কি ঘটনাও ঝাপসা করে দেয়।

নামবার জায়গাটা সঠিক মনে না থাকা কিছু আশ্চর্য নয়।

বাসে করে ক'বারই বা এসেছে। আর এলেও নামবার জায়গাটা সেদিন গৌণই ছিল।

এ বারে বাসেও কাউকে জিজ্ঞাসা করেনি কিছু। করে লাভ নেই। তার স্মৃতিতীর্থের ঠিকানা তখনই কে জানত যে এতদিন বাদে মনে করে রাখবে! ঠিকানা তাকে নিজেই খুঁজে বার করতে হবে।

এখানে আসাটাও একটা অদ্ভুত অপ্রত্যাশিত খেয়াল।

অপ্রত্যাশিত, কিন্তু অদম্য।

স্কুলের নামকরা একজন পৃষ্ঠপোষকের মৃত্যুতে স্কুল বসবার পরেই ছুটি হয়ে গেছে। স্কুল থেকে বেরিয়ে বাসায় ফিরতে আর ইচ্ছে হয়নি। যাবে তাহলে কোথায়? অন্তরঙ্গ বন্ধু তার সত্যিই কেউ নেই।

এক মামাতো বোন মীরার বাড়িতে যেতে পারে। মীরার স্বামী এখন কলকাতাতেই বদলী হয়েছে। গুটি-পাঁচেক পিঠোপিঠি ছেলেমেয়ে নিয়ে মীরার জমজমাট সংসার। কিন্তু সেখানে যেতে মন চায় না। মীরার আদর যত্ন আগ্রহ সত্ত্বেও কেমন যেন একটা

অস্বস্তি অনুভব করে। এই সুখী সংসারের পরিবেশে খাপছাড়া হওয়ার অস্বস্তি।

পারতপক্ষে সেখানে যায় না। আজ তো ভাবতেই পারছে না সেই ছেলেমেয়েদের আদরের বড় মাসী হয়ে বসে মীরার অনুযোগের সুরে বলা সংসারের উচ্ছ্বসিত খুঁটিনাটি বিবরণ শুনে বেলাটা কাটিয়ে দেবার কথা।

হঠাৎ মনের অতল থেকে এই অদ্ভুত ইচ্ছাটা যেন ঢেউ দিয়ে উঠল।

উঠল বোধহয় রাস্তার বাসটাকে দেখে।

শহরের সরকারী বাস নয়, গুড়ের নাগরীর মত মানুষ বোঝাই করে প্রতি মুহূর্তে ভেঙে পড়ার ভয়ে কাতরাতে কাতরাতে সমস্ত রাস্তাকে সচকিত করে যে সব হতভাগ্য যন্ত্রযান শহর ছাড়িয়ে দূরের পথে যায় সেই রকম একটা বাস।

বাসটা দেখেই নির্জন দ্বীপের মত ভূমিখণ্ডের কথা মনে পড়ল। এখুনি যেন সেখানে একবার না গেলে নয় এমনি অদম্য একটা বাসনা জাগল মনে।

কয়েক বছরেই বাসের নম্বর অনেক অদল বদল হয়েছে। খোঁজ-টোঁজ করে ওদিকে কোন বাস যায় সেটুকু শুধু জানতে হল। তারপর সত্যিই উঠে বসল একটাতে।

অসহ্য ভীড়। ঝাঁকানি আর দোলায় শরীরের ওপর দিয়ে একটা যুদ্ধ চলে যেন সারাক্ষণ। কিন্তু আজ সত্যিই তার খুব খারাপ লাগেনি।

এ যেন একরকমের জন-তরঙ্গ। তার মধ্যে নিজেকে মিশিয়ে দেওয়ার একটা বিচিত্র স্বাদ আছে, যে স্বাদটা না পেলে বর্তমান যুগটাকে ঠিকমত চেনা যায় না।

বর্তমান যুগকে চেনার আগ্রহে সে অবশ্য বাসে ওঠেনি। যেতে যেতে ওই অনুভূতিটা এক সময়ে জেগেছিল মাত্র।

বাস থেকে নেমেই অবশ্য সত্যিকার তৃপ্তি পেল।

চোখের সামনে এই অবারিত আকাশ, পৃথিবীর বিস্তার তো ভুলেই থাকে তার শহুরে জীবনে।

এর মধ্যে মুক্তির যে প্রকাশ আছে সেটা হয়ত অলীক।

এই নির্জন রাস্তাও গিয়ে ঠেলাঠেলি হানাহানি গঞ্জেই পৌছেছে, এই নবাঙ্কুরশ্যামল দিগন্তবিস্তৃত শস্যক্ষেত্র যেখানে শেষ হয়েছে, সেখানেও মানুষের লোভ ও দম্ভ তাদের ঘাঁটি বসিয়েছে; তবু এই ক্ষণিক বিভ্রমটুকুর মূল্য কম নয়। জীবনটা যে শুধু ভিত গাড়বার আর দেয়াল তোলবার জন্যে নয় একবার অন্তত সেই কথাটা মনে করিয়ে দেয়।

উমাপতির কথার প্রতিধ্বনি এটা। একদিন তার এই 'আন্দামানে'ই এই ধরনের কথা বলেছিল। বলেছিল, গাছের শেকড় চোখে দেখা যায়, মানুষের তা যায় না। মাটিতে শেকড় না চালিয়ে আমাদের উপায় নেই। তবু শেকড়টাকে মাঝে মাঝে ভুলতে হয় আকাশে ডালপালা মেলে ছড়িয়ে ঝড়ের আশায়। ঝড়ে পাতা ছিঁড়ে যে উড়ে যায় সেটা গাছের সত্যিকার মুক্তি নয়। কিন্তু সেই মুক্তির ছলনাটারও দাম আছে।

আন্দামানের রাস্তাটা এখন খুঁজে বার করবে কি করে?

ওপর ওপর দেখে তো মনে হচ্ছে জায়গাটার বিশেষ কিছু বদল হয়নি। শহরের লুব্ধ বাহু এখনও এতদূর পর্যন্ত প্রসারিত হতে পারেনি।

ভুল জায়গায় কি তাহলে নেমেছে?

আকাশে মেঘ আছে, কিন্তু বড় বড় ফাটল আছে দুপুরের প্রখর রৌদ্র ঝরে পড়ার। বেশ গরম বোধ হচ্ছে খানিকটা হেঁটেই। তবু জায়গাটা খুঁজে বার করতেই হবে।

শেষ পর্যন্ত বার করতেও পারল। সফল হবার পর মনে হল সত্যিই খুঁজে না পেলেই ভালো ছিল। তার স্বপ্নস্মৃতিটা অটুট রেখেই অন্তত সে ফিরে যেতে পারত।

সেই সরু কাঁচা আলের রাস্তাটা ঠিকই আছে, কিন্তু সেই বাঁশ-বাঁধা সাঁকোও নেই, সেই দ্বীপটুকুর ওপরকার কুটীরটাও।

আগাছার জঙ্গলে জায়গাটা ছেয়ে গেছে, তারই মধ্যে মাটির ক'টা ছোট ঢিবি আব বাঁশ-বাঁকারীর পোড়ো চালের কাঠামোটা যে উঁকি দিচ্ছে তাই বোধহয় সে কুটীরের ধ্বংসাবশেষ।

বাঁশের পোলটা না থাকায় সেখানে যাওয়া যায় না! গিয়েও কোন লাভ নেই। শুধু সাপখোপের বাসাই হয়ে আছে এখন।

অনেকক্ষণ তবু সেই দিকে চেয়ে জয়া দাঁড়িয়ে রইল।

এই চেয়ে থাকার একটা যন্ত্রণা আছে, অস্পষ্ট অনির্দিষ্ট যন্ত্রণা।

নিজেব অতীতের জন্যে দুঃখ হতাশা বা অনুশোচনা, এ সব কিছু নয়, শুধু নৈর্ব্যক্তিক একটা বেদনাবোধ সমস্ত জীবন আব সৃষ্টির অর্থহীনতার জন্যেই যেন।

জয়ার হঠাৎ মনে হল, কি জানি এই যন্ত্রণাটা পাওয়ার জন্যেই সে এখানে আসতে চেয়েছিল কি না। নিজের মনের অগোচরে তাই ছিল তার উদ্দেশ্য হয়ত।

সরু কাঁচা পথটায় ফিরে যেতে যেতে সেই দিনটার কথা মনে পড়ল আবার, যেদিন বাঁশের সাঁকো পেরিয়ে উমাপতির ঘরে অপ্রত্যাশিত ভীড় দেখে অপ্রস্তুত হয়ে পড়েছিল।

উমাপতি তার আসাটা সহজ করে দিতে চেয়েছিল একটু মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে, কিন্তু জয়ার আড়ষ্টতা অনেকক্ষণ কাটেনি।

উমাপতির সেদিন আরেক চেহারা। হাস্যে পরিহাসে তার সে প্রাণোচ্ছলতা দেখলে মনে হয় যেন এমনি মজলিস জমানোতেই তার সব চেয়ে আনন্দ।

রাজনীতির হোমরা-চোমরাদের সঙ্গে সে কৌতুকের কথা কাটাকাটি করেছে, সন্ন্যাসী ঠাকুরের সঙ্গে ধর্ম ও আধ্যাত্মিকতা নিয়ে আলোচনা করেছে মাঝে মাঝে রসিকতার ফোড়ন দিয়ে। তার কথায় খোঁচা

অবশ্য ছিল, কিন্তু তা এমন সরসতায় মাখানো যে সামনে অন্তত কেউ অসন্তুষ্ট হয়েছেন বলে বোঝা যায়নি।

রাজনীতির চাঁইরা স্পষ্টই তাকে নিজেদের দলে টানবার জন্যে এসেছিলেন।

নির্বাচনের তখনও অনেক দেরী, কিন্তু দলে টানাটানির লড়াই শুরু হয়ে গেছে। উমাপতি রাজী হলে বড় একটা দল তাকেই কাঁধে তুলে নিতে প্রস্তুত। উমাপতিকে কিছু ভাবতে হবে না। খরচ জোগানো থেকে খাটা খাটুনি সবই দল থেকে করা হবে।

উমাপতি হেসে বলেছে, ভাবনার কোন দরকারই থাকবে না বলছেন !

বড় চাঁই জোর দিয়ে বলেছেন,—নিশ্চয়ই।

নির্বাচনের আগেও না পরেও না ?—উমাপতি বেশ গম্ভীর হয়েই জিজ্ঞাসা করেছে।

দলপতিরা ঠিক বুঝতে না পেরে বলেছেন,—পরে আবার কি ভাবনা ! জিত তো আপনার অবধারিত। আমাদের নিশানা নিয়ে নামলে ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরেরও সাধ্য নেই আপনাকে হারায়।

সেই কথাই তো বলছি,—উমাপতি এবার হেসেছে,—আমায় শুধু নির্বাচনে দাঁড়িয়ে জয়ের মালাটা নিতে হবে। তার আগে পরে যা ভাববার আপনারাই ভাববেন ! আপনারা মানে আপনাদের দল।

চাঁইরা নির্বোধ নন। তাঁরাও হেসে উমাপতিকে আশ্বাস দিয়েছেন,—দল মানে তো আপনিও।

ওই ও-টাতেই যে আমার আপত্তি ও নয়, হ্রস্ব ই ধরে বসে থাকা আমার এক বদস্বভাব। দল বাঁধা তাই আর হবে না।

যেন এটা নিছক রসিকতা এমনভাবে হেসে উঠে উমাপতি সন্ন্যাসী ঠাকুরকে সম্বোধন করে তারপর বলেছে,—আপনি কি বলেন সাধুজি! আমিই সব নষ্টের মূল, আবার আমিই সব। তাই নয় ?

সন্ন্যাসী ঠাকুর সুযোগ পেয়ে বলেছেন,—আমি থেকে তুমি। তুমি থেকে তিনি। তাঁকে জানবার জন্যেই আমি দরকার।

সন্ন্যাসী ঠাকুর আরো অনেক গভীর দার্শনিক তত্ত্ব শুনিয়েছেন।

বুঝতেও পারেনি, ভালোও লাগেনি জয়ার!

কিন্তু তখন উঠে আসা যায় না। বাধ্য হয়েই তাকে থাকতে হয়েছে।

উমাপতি জয়ার অবস্থাটা বুঝতে পেরেছে। এক সময়ে বলেছে, তুমি আমাদের একটু চা খাওয়াও না জয়া দেবী। নিজের হাতে তৈরী করতে গেলে চা যে কেমন করে পাঁচন হয়ে যায় বুঝতে পারি না। দেখি তোমাদের শ্রীহস্তের স্পর্শে চায়ের পাতা একটু কোমল আর সরস হয় কি না!

জয়া কৃতজ্ঞ হয়ে পাশের ঘরে উঠে গেছে।

পাশের অপ্রশস্ত রান্না ঘরটায় গিয়ে চা করবার জন্যে স্টোভটা ধরিয়েও যেন অনেকটা স্বস্তি পেয়েছে। স্টোভের কর্কশ আওয়াজটাও তার কাছে তখন কাম্য। চারিধারে শব্দের একটা আবরণ দিয়ে স্টোভটা তাকে একরকমের নিভৃতি দিয়েছে অন্তত।

কেন সে এত ক্ষুব্ধ, নিজেকে জয়া প্রশ্ন করেছে।

কি আশা করে তাহলে সে এসেছিল? উমাপতিকে একেবারে একলা পাওয়ার?

পেলেই বা কি হত? কথা হত, তর্ক হত হয়ত, মতবিরোধ উগ্র হয়ে উঠত তার দিক থেকে, আগেও দু'একবার যেমন হয়েছে।

কিংবা হয়ত এসব কিছুই হত না।

এসে হয়ত দেখত উমাপতির মাঝে মাঝে যেমন হয়, সেই নীরব আত্মনিমগ্নতার পালা চলেছে। উমাপতি সাদর সম্ভাষণও জানাত—আনন্দও প্রকাশ করত তার আসায়, কিন্তু সবসুদ্ধ জড়িয়ে তাকে অনুপস্থিতই মনে হত। কি একটা অব্যক্ত বেদনা নিয়ে এক সময়ে জয়া ফিরে যেত।

এখন উমাপতি মৌনের বদলে মুখর। তবু সেই কুজ্ঝটিকার মত

নিরবয়ব নামহীন একটা ব্যথা কেন তার সমস্ত মনে ছড়িয়ে আছে! সেই সঙ্গে একটা অস্পষ্ট ভৎর্সনা নিজেকেই।

চায়ের জল ফুটে ওঠবার পর স্টোভ নেবাতে হয়েছে। ও ঘরের কথাবার্তা আবার কানে এসেছে।

উমাপতি সন্ন্যাসী ঠাকুরকে নিয়ে পড়েছে। বলেছে,—সাধন-ভজন করবার চেষ্টা দিনকতক করেছিলাম সাধুজি। মনে হচ্ছিল বেশ কয়েকটা ধাপ বুঝি পেরিয়েই এসেছি। ধোঁয়া সরে গিয়ে আলো বুঝি দেখা যায় যায়। ভয়ে সব ছেড়ে দিলাম একদিন। চট করে ছোটখাট একটা পাপ করে ফেললাম।

সাধুজী ছাড়া সবাই একটু-আধটু হেসেছেন।

একজন জিজ্ঞাসা করেছেন,—ভয় পেয়ে পাপ করলেন কি রকম?

—ভয় পেলাম পাছে সত্যিই মোক্ষ হয়ে যায়। তাহলে তো ফেরার রাস্তা বন্ধ। আর জন্ম-জন্মান্তর হবে না, এ মজার ছুনিয়ায় হাসতে কাঁদতে জ্বলতে জ্বালাতে আর আসতে পারব না। তাই যা হোক একটা পাপ করে পাকতে ওঠা ঘুটি কাঁচিয়ে নিলাম। পাপটাও কি বলে দিই। আমার মতই রাজ-অতিথি এক সঙ্গীর সঙ্গে না বলে কম্বল বদল। আমারটা পুরনো তারটা নতুন।

অন্যেরা হেসেছেন।

সাধুজী শুধু বলেছেন সসম্ভ্রমে,—এ পরিহাস আপনাকেই সাজে। আপনি স্বভাবমুক্ত তা বুঝিনি বলে লজ্জা পাচ্ছি।

উমাপতি কি জবাব দিত বলা যায় না। জয়া চা নিয়ে ঢোকায় সে প্রসঙ্গ চাপা পড়েছে। যথেষ্ট পেয়ালার অভাব জয়াকে বাটি গেলাস যা ছিল নিয়ে আসতে হয়েছে চা ঢেলে দেবার জন্যেই।

রাজনীতির জগতের একজন তারিফ করে বলেছেন,—বাঃ পাঁচন কোথায়? চা তো ভালোই।

তাহলে জয়া দেবীর হাতের গুণ বুঝুন! উমাপতি সোৎসাহে জয়ার হয়ে হঠাৎ ওকালতি করেছে,—আমার নামটা আপনাদের

খাতায় তুলতে চাইছেন, তার বদলে জয়া দেবীকে একটা কাজের মত কাজ দিতে পারেন? ওর হাতে শুধু চায়ের পাতাই কোমল হয়ে গলে না, ভিজে কাঠেও আগুন ধরে। ওর ওই আগুনের ছোঁয়ায় মশাল জ্বালিয়ে নিতে পারেন ইচ্ছে করলে। মশাল না জ্বালাতে দিলে পাছে অগ্নিকাণ্ড হয়ে যায় এই আমার ভাবনা।

জয়া লজ্জায় রাগে অপমানে ভেতরে ভেতরে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছে। নিজেকে সামলাতে পারবে না ভয়েই সে কেটলিটা নিয়ে পাশের ঘরে চলে গেছে।

কথাটা পরিহাসের সুরেই নিয়ে একজন চাই বলেছেন,—অগ্নিকাণ্ডের ভয়েই বুঝি আমাদের ওপর চালান করছেন!

না, সে ভয়ে নয়,—উমাপতির স্বরটা হঠাৎ রূঢ় ও কঠিন শুনিয়েছে,—আমার এই চালাঘর জ্বললে কতটুকু আর লোকসান হবে। আপনাদের ওপর করুণা করেই চালান করছি ভাবুন না। ঘর জ্বালাবার কি মশাল ধরাবার কোন আগুনই তো আপনাদের নেই মনে হয়।

এরপর আসর আর তেমন জমেনি।

সাঙ্গপাঙ্গ সমেত চাঁইরা আগে বিদায় নিয়েছেন। তারপর সন্ন্যাসী ঠাকুর।

সন্ন্যাসী ঠাকুর চলে যাবার সময় উমাপতি বলেছে,—আমায় সত্যিই ক্ষমা করবেন সাধুজি। যা বুঝি না তা নিয়ে রসিকতা করা আমার অন্যায় হয়েছে।

অন্যায় আপনার নয়, আমার। আপনাকে আমি চিনতে পারিনি।—বলে সন্ন্যাসী ঠাকুর প্রসন্নভাবে হেসে বিদায় নিয়েছেন।

জয়াও তাঁর প্রায় পিছু পিছুই যাবার জন্যে পা বাড়িয়েছে।

যেও না।—বলেছে উমাপতি। কঠিন আদেশের সুরই প্রায়।

জয়া অগ্নিমূর্তি হয়েই ফিরে দাঁড়িয়েছে,—আমার যাওয়া না-যাওয়া কি আপনার মর্জির ওপর নির্ভর করে নাকি? সে অধিকার আপনাকে দিয়েছি বলে তো মনে পড়ে না।

এই তীব্র জ্বালাময় আঘাতও সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে উমাপতি বলেছে শান্ত গম্ভীর স্বরে,—তুমি নির্বোধ নও জয়া। সস্তা নাটকের নায়িকা হওয়া তোমায মানায় না!

জয়া তবুও থামেনি। তিক্ত কণ্ঠে বলেছে,—না, নাটক মানায় শুধু আপনাকে! ইচ্ছেমত রাজা মন্ত্রী ভাঁড় সব আপনি সাজতে পারেন। হাততালি দেবার দর্শক পেলেই আপনার অভিনয় বেশী খোলে। কিন্তু আপনার মুগ্ধ দর্শক হবার আমার কোন বাসনা নেই, আপনার বিদ্রূপের ধার পরীক্ষা করবার নিশানা হয়েও আমি ধন্য হতে পারব না।

উমাপতি এ কথার কোন জবাব দেয়নি। অত্যন্ত আহত দৃষ্টিতে তার দিকে খানিক চেয়ে থেকে নীরবে এগিয়ে এসে হঠাৎ তাব হাতটা ধরে একটু টেনে কাছের টুলটার ওপর বসিয়ে দিয়েছে।

স্তম্ভিত বিহ্বল হয়েই কি জয়া কোন বাধাই আর দিতে পারেনি!

তার সমস্ত শরীর অবশ হয়ে গেছে মনে হয়েছে।

হঠাৎ বুকের কোন অতল থেকে অদম্য কান্না তার উথলে উঠেছে। সামনের উমাপতির বিছানাটার ওপর মুখ গুঁজে সে কান্না সে দমন করবার চেষ্টা করেছে। কিন্তু সফল হয়নি।

উমাপতি তার পিছনেই তখন দাঁড়িয়ে। জয়াকে শান্ত করবার কোন চেষ্টা সে করেনি। বলেনি একটা কথাও।

অনেকক্ষণ বাদে জয়া বিছানা থেকে মুখ তুলে চোখ মুছেছে। উমাপতির দিকে তবু ফেরেনি।

উমাপতি তখনও নীরব।

জয়াই প্রথম শক্তি সঞ্চয় করে উমাপতির দিকে ফিরে বসে ম্লান কুণ্ঠিত স্বরে বলেছে—আমায় আজ যেতে দাও।

উমাপতির মুখের দিকে তখনও সে চোখ তুলে তাকায়নি।

তাই দিলাম।—উমাপতির গাঢ় স্বর যেন কোন দূর থেকে ভেসে এসেছে,—আজ তোমায় থাকতে বলার সাহসও আমার আর নেই।

নিজেদের ওপর বিশ্বাসের অভাবে নয় জয়া, সমাজের মুখ চেয়েও নয়, শুধু পাছে এই দুর্লভ মুহূর্তটি দীর্ঘ করে তোলবার অতিরিক্ত আগ্রহে ম্লান হয়ে যায় এই ভয়ে।

জয়া উঠে দাঁড়িয়ে ধীরে ধীরে ঘরের বাইরে গেছল। উমাপতিও এসেছিল তার সঙ্গে।

বেরিয়ে এসেও জয়া তখুনি চলে যেতে পারেনি। বাঁশের সাঁকোটার ওপর দু' পা গিয়ে ফিরে দাঁড়িয়েছিল।

উমাপতি কিছু দূরে পাড়ের ওপর থেকে তখন তার দিকে চেয়ে আছে। কেউই কোন কথা আর বলেনি।

বিস্তীর্ণ জলা আর ধান ক্ষেতের ওপর দিনের আলো তখন ম্লান হয়ে আসছে। সমস্ত আকাশেই বুঝি নিরুপায় বিচ্ছেদের একটা বিষণ্ণ কাতরতা। জলার ওপরকার দীর্ঘ ঘাসগুলো হঠাৎ ওঠা একটা হাওয়ায় একটু কেঁপে উঠেই স্থির হয়ে গেছল, তাদেরই মত যেন শেষ একটা কথা বলতে গিয়ে থেমে যাওয়ার বেদনায়।

জয়ার মনে হয়েছিল এই মুহূর্তটা যদি কোন অলৌকিক যাদুতে অচল করে ধরে রাখা যেত।

এই মুহূর্ত আর এই ছবি, যে ছবির মধ্যে তারা চিরকালের মত স্থির নিস্পন্দভাবে আঁকা।

কাছে যারা কোনদিনই যেতে পারবে না, এই বিদ্যুৎচঞ্চল দূরত্বটাই তাদের চিরন্তন হয়ে থাক।

এর বেশীও নয় কমও নয় কিছু।

অনেক দূরে একটা বাসের ঘন ঘন হর্ন ই শোনা যাচ্ছে মনে হয়েছিল।

শহরে ফিরে যাবার বিরল সেই যান, যার রূঢ় নীরস আহ্বান উপেক্ষা করা যায় না, যে নির্বিকারভাবে ধোঁয়া ধুলোয় মলিন প্রত্যহের জগতে ফিরিয়ে নিয়ে যায়।

আজও বড় রাস্তায় নেমে একটা গাছের ছায়ায় জয়াকে সেই বাসের জন্যেই অপেক্ষা করতে হল।

সেদিন বাস যখন পেয়েছিল তখন প্রায় অন্ধকার হয়ে এসেছে। বাসটাই যেন তারপর পেছনের সমস্ত পথ প্রান্তর ও স্মৃতি অন্ধকারে মুছে দিতে দিতে ছুটে চলেছিল।

আজ অন্ধকার নয়, প্রখর দ্বিপ্রহরের মেঘভাঙা রৌদ্রের আলো। কিন্তু তবু মনে হয় বাসটা সেই দূর অতীতে ফিরে যাওয়ার অন্ধকার রাত্রিই বুকে করে নিয়ে আজও আসছে! পেছনের নলের নোংরা ঘন গ্যাসের ধোঁয়ার সঙ্গে এখুনি সেই নিবিড় রাত্রি ছড়িয়ে দেবে অন্তরে বাইরে সর্বত্র।

সতর

অসীম রাহা অবাক।

তাব ফোন এসেছে।

ফোন আসাটা কিছু অভাবনীয় নয়। অফিসে অমন অজস্র আসে। বন্ধুবান্ধবেব তো বটেই, তা ছাড়া লেখার তারিফ জানিয়ে কিংবা লেখাবই জন্যে শাসিয়ে, লেখা যাদের ভালো লাগে বা জ্বালা ধবায় তাদেব কাছ থেকে।

কিন্তু এখন তো তাকে অফিসেই পাবার কথা নয়। ক'দিন আগেই সে ছুটি নিয়েছে। আজ এসেছিল শুধু মাইনেটা নেওয়াব জন্যে। অসময়েই এসেছে। যাবা তাকে ফোন কবে বা কবতে পারে তাবা জানে যে বেলা তিনটেব আগে অফিসে তাকে পাওয়া যায় না।

এখন তো বারোটা!

তা ছাড়া ফোনে যে ডাকছে সে একটু বহস্যেই নিজেকে আবৃত বাখতে চায়।

প্রথমত মহিলা, দ্বিতীয়ত পবিচয় দিতে নাবাজ।

অপারেটর জিজ্ঞাসা কবায় বলেছে, পরিচয় তাঁকেই দেব। আপনাদের অফিসটা কি ব্রহ্মচর্যাশ্রম যে মেয়েদের ফোন এলে ধবা বারণ!

অফিসে উপস্থিত থাকা সত্ত্বেও ফোনেব ডাক তাব কাছে না পৌঁছোতেই পারত। অপারেটর এ সময়ে তাকে পাওয়া যায় না জেনে সে কথা বলে ফোন কেটেই দিতে যাচ্ছিল। অনুতোষ ঘটনাক্রমে সেখানে উপস্থিত থাকায় বাবণ করেছে। অনুতোষ অসীমকে মাইনে নিয়ে ক্যান্টিনের দিকে যেতে দেখেছিল। তাই সে নিজেই ফোনটা নিয়ে কে ফোন করছে জানতে চেয়েছে। তাতে

ওই উত্তর পেয়েই উৎসুক হয়ে উঠেছে একটু। নইলে হয়ত নিজে তাকে ক্যান্টিনে খুঁজতে আসার পরিশ্রমটুকু স্বীকার করত না।

আপাতত অনুতোষের কাছেই অসীম খবর নিচ্ছিল বিস্ময়ের সঙ্গে একটু বিরক্তি নিয়েই।

অনুতোষ অবশ্য রহস্যটার ওপর রং চড়িয়ে পরিহাস করছিল।

অসীম কিন্তু ভাবনাতেই পড়েছে তখন। সে অফিসে নেই বলে ফোনটা কেটে দিতে বলবে কিনা স্থির করতে পারছিল না। কিন্তু কৌতূহলটাই জয়ী হল শেষ পর্যন্ত।

ফোনটা গিয়ে ধরার পর সত্যিই বিস্ময়ের অবধি রইল না। কৌতূহল যে জয় করতে পারেনি সেটা ভাগ্য বলেই মনে হল।

ও প্রান্তের কণ্ঠটা তখন ঝাঁঝালো।—কে? মিঃ রাহা? কতক্ষণ দাঁড় করিয়ে রেখেছেন জানেন?

কি করে জানব?—অসীম একটু ব্যঙ্গের সুরেই বললে,—খবর পেয়েই ছুটে আসছি। আপনি ফোন করবেন জানলে ফোনটা কানে লাগিয়েই অবশ্য বসে থাকতাম। ফোন করে কে আমায় ধন্য করছেন এবার একটু জানতে পারি কি?

এখনো বুঝতে পারেননি!—স্বরটা এবার কৌতুকের।

একটু অনুমান করতে পারছি মাত্র। কিন্তু অনুমানটা বিশ্বাস করতে সাহস হচ্ছে না। নিজেকে অস্পৃশ্য অন্ত্যজ বলেই জানতাম। হঠাৎ এ ক'দিনের মধ্যে কি জাতে উঠে গেলাম নাকি? এত অনুগ্রহ কেন বলুন তো!

বিদ্রূপটা সম্পূর্ণ বৃথাই গেল মনে হল ওদিকের নির্বিকার প্রায়-ধমক দিয়ে কথা বলার ধরনে।

লেখেন তো বেশ! কথা এত বাজে বলেন কেন? শুনুন। উমাপতির একটা ছবি দেখবেন? এখুনি এলে দেখাতে পারি!

উমাপতির ছবি আমি অনেক দেখেছি।—অসীম ইচ্ছে করেই গলাটাকে একটু কর্কশই হতে দিলে।

সে-সব ছবি নয়!—আবার ঝংকার শোনা গেল,—সে-সব ছবি হলে আপনাকে ডাকতাম? এ একটা পোরট্রেট। ভেবেছিলাম হারিয়ে গেছে। হঠাৎ পেয়ে গেলাম। তাই ভাবলাম আপনার উমাপতি সম্বন্ধে যখন এত আগ্রহ, আপনাকেই একবার ডেকে দেখাই।

অশেষ ধন্যবাদ! কিন্তু আমার আগ্রহ উমাপতির জীবন সম্বন্ধে আছে বলে তাঁর পোরট্রেট দেখবার জন্যেও থাকবে, ভাবলেন কি করে?

আগ্রহ না থাকে আসবেন না। আর যদি থাকে এখুনি এই ঠিকানায় আসতে পারেন।

ঠিকানাটা দেবার পরই ওধারের ফোনটা নামবার আওয়াজ পাওয়া গেল।

না গেলেও পারত, এবং তাহলে ক'বারের সাক্ষাতে সংঘর্ষে যা সয়েছে তার একটু জবাব দেওয়া যেত বোধহয়।

কিন্তু অসীম বাহা না গিয়ে পারল না।

ঠিকানাটা দ্রুত কণ্ঠে ফোনে একবারই মাত্র শুনেছে। সেইটুকুই যথেষ্ট। বলা মাত্র সে বুঝতে পেরেছে। জায়গাটা তার জানা।

শহরের মাঝখানে আগেকার খাস সাহেবী পাড়ায় বাগানঘেরা একটি সেকেলে বড় বাড়ির এক অংশের দুটি বড় বড় ঘর। একেবারে হালের উঠতি একটি ছোট শিল্পীগোষ্ঠীর সেইটি আস্তানা। এরা বেশীর ভাগই সবকিছু সেকেলে সংস্কার-ভাঙা বিদ্রোহী। বিশুদ্ধ বস্তু-নিরপেক্ষ ছবির আদর্শ অনুসরণ করে ফেরে।

দু'একবার এখানে ছবির প্রদর্শনী দেখতে এসেছে। শিল্পীদের দু'একজন অগ্রণী তার পরিচিত। মলি চৌধুরীকে এদের মধ্যে কোনদিন অবশ্য দেখেনি। এই ঠিকানা দেওয়ায় তাই বিস্মিত যেমন, তেমনি একটু চিন্তিতও হয়েছিল কি রকম ছবি দেখতে হবে ভেবে!

তবে সত্যিই ছবি দেখার আকর্ষণে সে কি এসেছে?

মলি চৌধুরীরও তাকে ডাকার একমাত্র উদ্দেশ্য ছবি দেখানো কিনা কে জানে!

অসীমকে খোঁজাখুঁজি করতে হল না। ট্যাক্সি থেকে নামতে না নামতে মলিকেই প্রদর্শনীর বড় হলঘরটা থেকে বেরিয়ে আসতে দেখা গেল। আজকের সাজটায় উগ্রতা যেন একটু কম।

আসুন। জানতাম, না এসে পারবেন না!—মলি চৌধুরীর হাসিটা বিদ্রূপের কিন্তু নয়।

ট্যাক্সির ভাড়া চুকিয়ে মলিকে অনুসরণ করতে করতে অসীম বললে,—জানবেন না কেন? কোন টোপে কোন মাছ জব্দ ঝানু শিকারী মাত্রেই জানে।

মলি চৌধুরী ধমক দিয়ে উঠল,—অকৃতজ্ঞ হয়ে যা তা গালাগাল দেবেন না। তাহলে কড়া কথা শুনবেন। কি আপনি আহামরি মাছ যে আপনাকে টোপ ফেলে শিকার করতে হবে মলি চৌধুরীকে! একটু উপকার করতে চাইলাম দয়া করে, তার এই প্রতিদান!

হলঘরটার ভেতর দিয়ে পাশের অপেক্ষাকৃত ছোট ঘরটায় তখন তারা পৌঁছেছে। দুটো ঘরই এখন নির্জন। শিল্পীদের জমায়েত হবার এটা সময় নয়। একজন বেয়ারা ছাড়া আর কাউকে কোথাও দেখা গেল না।

বেয়ারা একদিকে কতকগুলো বাঁধানো ছবি দেয়ালের ধারে সাজিয়ে রাখছিল। তাদের দেখে বেরিয়ে যাবার পর অসীম বললে,—হঠাৎ দয়াটা কেন উথলে উঠল জানতে পারলে প্রতিদানটা উচিত মত দেবার চেষ্টা করতে পারি।

দয়া হঠাৎই উথলে ওঠে, আর অপাত্রেই বেশীর ভাগ। বসুন।—বলে ঘরের একদিকের ক'টি বিচিত্র আকারের আসনের দিকে মলি অঙ্গুলি নির্দেশ করলে।

মলির সঙ্গে অসীমকেও বসতে হল, সামনাসামনি দুটি আসনে। আসনগুলি চেহারায় যত চমকদার, বসবার পক্ষে তত আরামপ্রদ নয়।

তা না হোক, এ ঘরের চারদিকের দেয়াল যেসব ছবিতে প্রায় ঢাকা তাদের মধ্যে আসনগুলিকে বেমানান লাগে না। তাছাড়া ওগুলির চেয়ে উৎকৃষ্ট কোন বসবার জায়গা নজরে পড়ল না।

ঘরটি শিল্পীগোষ্ঠীর ছবির সংগ্রহাগার হিসেবেই প্রধানত ব্যবহৃত হয় বোঝা গেল। ইচ্ছে করলে কোন শিল্পী এখানে বসেও সাধনা যাতে করতে পারেন এক কোণে তারও ব্যবস্থা রয়েছে। সে ব্যবস্থা মেঝের ওপর।

ঘরের চারিদিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে অসীম একটু হেসে বললে,—অপাত্র হিসেবে এখন আপনার দয়ার নমুনাটা একটু দেখতে পারি ? কি রকম উদ্‌গ্রীব হয়ে এসেছি বুঝতেই পারছেন !

প্রথমে তাহলে অত ভড়ং করেছিলেন কেন ?

করেছিলাম বোধহয় একটু হতবুদ্ধি হয়ে। কোন মলি চৌধুরীর সঙ্গে কথা বলছি বুঝতে না পেরে !

তার মানে ?—মলি চৌধুরীর মুখে রাগের ভান।

মানে, এক রাত্রে যিনি ইস্পাতের ফলা, আরেক তুপুরেই তিনিই করুণার নদী হতে পারেন এটা ভাবতে পারিনি।

মলি চৌধুরী উচ্চৈঃস্বরে হেসে উঠল। সরল সঙ্গীতময় হাসি,—পিয়ানোর ওপর লঘু নিপুণ স্পর্শ দ্রুত বুলিয়ে নিয়ে যাওয়ার মত।

হাসি থামিয়ে বললে,—সে রাতের কথা আপনি এখনো ভুলতে পারেননি ?

ভোলা কি যায় !—অসীমের গলার স্বর খুব হাল্কা নয়।

নাই বা ভুললেন।—মলি চৌধুরীকেও গম্ভীর মনে হল,—মনে করুন এ আরেক মলি চৌধুরীর সঙ্গে নতুন পরিচয় করছেন। তাতে বোধহয় আপত্তি নেই ?

না, তা নেই।—অসীম এবার হাসল,—আশা করি রাতের সে মলি চৌধুরী হঠাৎ ফণা তুলে উঠবে না !

না, তা উঠবে না।—মলি চৌধুরীর চোখ তুটো কেমন জ্বলে

উঠল,—যেখানে সে নিজেকে লুকোতে চায় সেখানে তাকে নাড়া না দিলে সে ফণা তোলে না।

দুজনেই খানিকক্ষণ নীরব।

মলিই প্রথম হেসে উঠে ঘরের ভারী হাওয়াটা হাল্কা করে দিয়ে বললে,—যাক বোঝাপড়া একরকম একটা এখন হয়ে গেছে, এবার আপনাকে ছবিটা দেখাই।

মলি উঠে দাঁড়াতে অসীম একটু কৃত্রিম আতঙ্কে ঘরের দেয়ালগুলোর ওপর চোখ বুলিয়ে বললে,—বুঝতে পারব তো? উমাপতি বলে চেনা যাবে আশা করি।

যাবে! যাবে!—মলি উঠে গিয়ে দেয়ালের ধারে সাজিয়ে রাখা ছবিগুলির ভেতর থেকে একটি তুলে নিয়ে এসে অসীমের সামনের নীচু বিচিত্র টেবিলটার ওপর রেখে বললে,—এ অ্যাবস্ট্র্যাক্ট পেন্টিং নয়, দস্তুরমত ব্যাকরণসম্মত তেল-রংএর ছবি। উমাপতি ঘোষালের ভেতরটা না ধরা পড়ুক বাইরেটা চেনা যায়।

অসীম উত্তর দিলে না!

ছবিটার দিকে সত্যিই সবিস্ময়ে সে তখন চেয়ে আছে।

উমাপতি ঘোষালকে সে কয়েকবার দেখেছে, তাঁর আলোকচিত্রের কথা না হয় নাই ধরল। কিন্তু উচ্চস্তরের কোন শিল্পকর্ম বা বৈশিষ্ট্য না থাকলেও এ ছবিতে এমন কিছু আছে যা বিস্ময় জাগায়।

সেই এমন কিছুটা কি, ঠিক বুঝতে না পেরে অসীম জিজ্ঞাসা করলে,—এ ছবি কার আঁকা?

আমার!—বলে মলি চৌধুরী এই প্রথম বুঝি একটু কুণ্ঠিতভাবে হাসল। বললে,—উমাপতির সঙ্গে পরিচয় হবার কিছুদিন বাদেই নিজের খেয়ালে এটা এঁকেছিলাম। তারপর ভুলেই গিয়েছিলাম ছবিটার কথা। এখানকার পুরনো বাতিল অনেক ছবির মধ্যে থেকে হঠাৎ কাল আবিষ্কার করলাম। আবিষ্কার করে মনে হল ছবিটা আপনাকে দেখালে মন্দ হয় না।

আমার কথা মনে পড়ার জন্য কৃতজ্ঞ।

দোহাই, ও সব শুকনো ভদ্রতাগুলো এখন রাখুন!—মলি চৌধুরী সত্যিই আহত স্বরে বললে,—আমার ছবি আঁকার বাহাদুরি দেখাতে আপনাকে ডাকিনি এটুকু বিশ্বাস করতে পারেন। ছবিটা কিছুই হয়নি আমি জানি, তবু আপনি যা খুঁজছেন এ ছবি দেখলে হয়ত তার কিছু হদিস পাবেন। এমন এক উমাপতি ঘোষালকে এ ছবিতে ফোটাতে চেয়েছিলাম যাকে আর কেউ দেখেনি বলেই আমার ধারণা।

শিল্পীরা যখন দেখে তাদের প্রত্যেকের সব দেখাই এমনি অনন্য হয় না কি?—অসীম মৃদু একটু প্রতিবাদ জানাল প্রশ্নের ছলে।

না, না, আপনাকে আমিই বোধহয় বোঝাতে পারছি না আমার কথাটা।—মলি চৌধুরীকে কেমন অস্থির মনে হল,—এ ছবিতে উমাপতির সাধারণ সাদৃশ্যের বাইরে আর কিছুই কি পেলেন না?

অসীম রাহা তখন পেয়েছে। মুখে কিছু না বললেও নাতিনিপুণ হাতের ছবিতেও যা বিস্ময় জাগায় সেই এমন-কিছুর রহস্য সে তখন বুঝতে পেরেছে।

এ ছবি উমাপতির নয়, মলয়ার। তারই উদ্দাম উদ্বেল হৃদয়ের হতাশ এক আকুলতার ছবি।

মলি চৌধুরী নিজে কি সে কথা জানে না?

জানুক বা না জানুক, তাকে হঠাৎ এ ছবি দেখাবার জন্যে আগ্রহ কেন?

সেদিনকার রাত্রের সেই ব্যবহারের তিক্ত জ্বালা একটু ভুলিয়ে দেবার চেষ্টা?

একটু অনুশোচনা?

কিন্তু মলি চৌধুরীকে সে জাতের মেয়ে তো মনে হয় না। অনুশোচনা কিছু হলেও তা প্রকাশ করবার গরজ তার না থাকবারই কথা।

তাহলে সত্যিই কি মলি চৌধুরীর মধ্যে দুই বিরোধী সত্তা

বিদ্যমান! রাতে যে মলি চৌধুরী দিনে সে মলয়া? এরকম ভিন্ন ভিন্ন সত্তা অনেকের মধ্যেই হয়ত থাকে, কিন্তু তা এত স্পষ্ট, পর-স্পরের সঙ্গে এমন সম্পর্কহীন নয়।

উমাপতির প্রতিকৃতির মধ্যে কাকে খুঁজে পাওয়া যায়? রাতের সেই মলি চৌধুরীকে না দিনের এই মলয়াকে?

এ প্রশ্নটা হয়ত অবান্তর অর্থহীন। মলি চৌধুরী এ ছবি আঁকবার পর তার কথা ভুলেই গিয়েছিল বলেছে। ভুলে যাওয়াটা যদি বিশ্বাস করতে হয় তাহলে কেমন করে ভুলতে পারে সেইটেই সবচেয়ে বড় প্রশ্ন নয় কি?

ভুলে যেতে চাওয়াও তো ভুলে যাওয়ার ছলনা করে কখনও কখনও।

কিছু বলছেন না যে!

অসীমের নীরবতা একটু দীর্ঘ হয়েছে সন্দেহ নেই। কিন্তু অধৈর্যের বদলে কেমন একটা কাতরতাই যেন প্রকাশ পেল মলি চৌধুরীর কণ্ঠে।

যা বলতে চাই নিজের মনেই সেটা ঠিক স্পষ্ট করে তুলতে পারছি না।—অসীম সম্পূর্ণ সত্য গোপন করলে না,—ছবিটার কথা তো আপনি ভুলেই গিয়েছিলেন বলছেন। এটা আমি নিয়ে যেতে পারি?

অত ভনিতা করবার দরকার নেই।—মলি চৌধুরী সহজ হয়ে হেসে উঠল,—আপনাকে দেবার জন্যেই ডেকেছি। স্বার্থ বা অসুস্থ কৌতূহল, কারণ যাই হোক তবু তো একজন উমাপতিকে মনে করে খুঁজে বার করবার চেষ্টা করছে!

একটু থেমে সম্পূর্ণ ভিন্ন স্বরে মলি চৌধুরী বললে,—কিন্তু আপনাকে একটু সাবধানও না করে পারছি না, উমাপতির মত মানুষকে খুঁজতে যাওয়ার বিড়ম্বনা আছে।

ছবিটা নিয়ে কিছুক্ষণ বাদেই অসীম বিদায় নিয়েছিল সেদিন।

যেতে যেতে তার মনে হয়েছিল, সেদিন রাত্রে যে উগ্র ঘৃণাময়ী মেয়েটিকে জেনেছিল, তার চেয়ে দিনের আলোর এই প্রায়-স্নিগ্ধ মেয়েটি অনেক বেশী দুর্বোধ।

আঠার

শ্রীহরির কথাতেই বিপিন ঘোষ বাইরের দাওয়ায় ভাঙা তক্তপোষটার ওপর বসে অপেক্ষা করে।

নিশীথ পাত্র কিছুক্ষণ বাদেই আসবেন। বিপিন ঘোষকে তিনি বসিয়ে রাখতে বলে গেছেন শ্রীহরিকে।

নিশীথ পাত্রের এই বসিয়ে রাখতে বলাটা এমন অস্বাভাবিক যে বিশ্বাস করতে মন সহজে চায় না।.

বিপিন ঘোষ এ বাড়িতে এসে যতক্ষণ খুশী বসে থাকতে পারে, এবং বসে থাকলে নিশীথ পাত্র তাকে সহ্য করবেন নিশ্চয়, কিন্তু তাঁর নিজে থেকে বিপিন ঘোষকে ধরে রাখার নির্দেশ দিয়ে যাওয়াটা প্রায় কল্পনাতীত।

নিশীথ পাত্রের সঙ্গে তার সে রকম সম্পর্ক কোনদিনই নয়।

বিপিন ঘোষ নিজেকে চেনে এবং সেই সঙ্গে তাকে যারা চিনে ফেলেছে তাদেরও।

নিশীথ পাত্র তাকে চেনেন বিপিন ঘোয ভালো করেই বোঝে।

তবু তাকে নিজের গরজেই নিশীথ পাত্রের কাছে মাঝে মাঝে আসতে হয়। গবজটা অবশ্য সব সময়ে প্রত্যক্ষ স্থূল স্বার্থের নয়। নিশীথ পাত্রের কাছে মাঝে মাঝে সে যে আসে এটা লোকের চোখে পড়ারও একটা পরোক্ষ মূল্য আছে।

প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ, স্থূল ও সূক্ষ্ম স্বার্থ ছাড়া আর কোন কারণ কি নেই যা বিপিন ঘোষের মত মানুষকে নিশীথ পাত্রের এই টিনের চালার বাড়িতে টেনে আনে ?

আছে নিশ্চয়ই। কিন্তু বিপিন ঘোষের কাছেও তা দুর্বোধ।

উমাপতি ঘোষালের মৃত্যুর পর থেকে অন্তত সে বেশ ঘন-ঘনই এখানে এসেছে এবং সব সময়ে স্পষ্ট বা অস্পষ্ট কোন উদ্দেশ্য নিয়ে নয়।

কে জানে এটা হয়ত তার একরকমের বিশ্রামের জায়গা যেখানে তার কপট মনকে সজাগ হয়ে সারাক্ষণ সেজে থাকতে হয় না, যেখানে তার সত্যকার পরিচয় জানা সত্ত্বেও দরজা কোন সময়ে বন্ধ হবে না সে জানে।

নীরজা দেবীর কাছে হার মেনে সেদিন অস্ফুট এমনি একটা তাগিদেই নিশীথ পাত্রের কাছে এসেছিল।

নিশীথ পাত্রের বাড়িতে সেদিন প্রায় মেলা বসেছে। তাঁর দেশগাঁয়ের এক পাল মেয়ে-পুরুষ গঙ্গাস্নান, কালীমাতা দর্শনের সঙ্গে কলকাতা ভ্রমণ সারবার জন্যে তাঁর আস্তানাতেই এসে উঠেছে।

এরকম মাঝে মাঝে তাঁর বাড়িতে অনাহূত অতিথিসমাগম হয়।

উঠোনে দাওয়ায় কোথাও তখন আর জায়গা থাকে না দাঁড়াবার।

দরজা থেকেই ভীড় দেখে বিপিন ফিরে যাচ্ছিল, কিন্তু এসে একবার দেখা না করে চলে যেতে মন চায়নি। তাই ভীড় ঠেলে নিশীথ পাত্রের ঘরেই গিয়ে ঢুকেছিল।

সেখানেও ভীড়। তবে অন্যরকম। একজন ডাক্তার বসে বিছানায় শায়িত নিশীথ পাত্রের রক্তের চাপ পরীক্ষা করছেন। ছোট বড় কয়েকজন তাদেরই দলের কর্মী উদ্বিগ্নভাবে তাঁদের ঘিরে দাঁড়িয়েছেন।

ডাক্তার পরীক্ষা শেষ করে যন্ত্রটা বন্ধ করতে করতে গম্ভীর মুখে কিছু বোধহয় বলতে যাচ্ছিলেন।

তার আগেই নিশীথ পাত্র সকৌতুক মুখভঙ্গি করে বলেছিলেন,—বড় সঙীন অবস্থা, না ডাক্তার!—ওরে তোদের নন্দ খুড়ো এবার বুঝি পটল তোলে!

তারপর সেই প্রাণখোলা ছাদ-ফাটানো হাসি।

ডাক্তার শশব্যস্ত হয়ে বলেছিলেন,—ওকি, করছেন কি? ওরকম-ভাবে হাসবেন না।

নিশীথ পাত্র হঠাৎ হাসি থামিয়ে গম্ভীর হবার ভান করেছিলেন,—হাসতে মানা করছ ডাক্তার? হাসলে রক্তটা হঠাৎ ছলকে উঠে হৃদ্‌পিণ্ডটা ফাঁসিয়ে দিতে পারে, না?

কোনরকম বেশী উত্তেজনা পরিশ্রম, যাকে বলে হঠাৎ চাঞ্চল্য আপনার পক্ষে ভালো নয়।—ডাক্তার বোঝাবার চেষ্টা করেছিলেন।

তাহলে কি ভালো বল তো? শুধু অসাড় হয়ে শুয়ে শুয়ে বেঁচে থাকা? আরে হাসিই যদি বন্ধ হল তা হলে বাঁচার দরকারটা কি!—বলতে বলতেই আবার সেই হাসি।

ডাক্তার হতাশভাবে বলেছিলেন—আপনি যদি কোন কথা না শোনেন তাহলে আমরা নাচার!

নাচার আমিও ডাক্তার,—নিশীথ পাত্র আবার গম্ভীর হয়েই বলেছিলেন,—ক'টা বছর পরমায়ু বাড়াবার জন্যে তোমাদের কথা আর শুনতে পারব না। তোমার যা করবার করো, বলবার বলো, আমারও যা করবার করি। এই আমাদের আপোস। তুমি রেগেমেগে গিয়ে গোটাকতক বিদঘুটে ওষুধ গুলে পাঠাতে পারো অবশ্য!

হাসতে হাসতেই তারপর ডাক্তারকে বিদায় দিয়ে নিশীথ পাত্র অন্য সকলের দিকে ফিরেছিলেন।

বলেছিলেন,—বেঁচে বেঁচে বাঁচাটাও রোগ হয়ে দাঁড়ায় তা জানিস? আমার তাই হয়েছে। ডাক্তারের দল যা বলে বলুক, সহজে মরব বলে আশা হয় না। আমার জ্ঞান থাকতে আর ডাক্তার ডাকিস না কিন্তু।

অনুগত ভক্তদের মৃদু প্রতিবাদ অগ্রাহ্য করে বিপিনকেই জিজ্ঞাসা করেছিলেন হেসে,—কি, কাঁধ দিতে এসেছিলে নাকি? বাধিত করতে পারলাম না হে! তবে পারলেও তোমার ও পলকা কাঁধে কি আমার ভার সইবে!

কথাটায় প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত কিছু থাকতেও পারে।

নিশীথ পাত্রের বদলে আর কেউ হলে বিপিন ঘোষ জুৎসই জবাবই

দিত বোধহয়। বলত,—আপনার ভারে পলকা কাঁধ যদি ভাঙে সে তো সৌভাগ্য।

কিন্তু নিশীথ পাত্রকে পরিহাসচ্ছলেও এটুকু খোশামুদি করতে কোথায় বাধে।

উত্তর না দিয়ে সে তাই হেসেছিল একটু। খানিক বাদে বিদায় নিয়ে বলেছিল,—আপনার সঙ্গে একটু কথা ছিল। আরেক দিন আসব।

নিশীথ পাত্র হ্যাঁ-ও বলেননি না-ও নয়। কোনদিনই বলেন না।

তবু আজ তার আসা তিনি কি আগে থাকতেই অনুমান করে রেখেছিলেন? ঠিক আজকের দিনেই না হোক, সে ইতিমধ্যে আসবেই জেনে, নিজে সে সময়ে উপস্থিত না থাকলে তাকে বসিয়ে রাখবার নির্দেশ দিয়ে রেখেছিলেন অন্তত।

বিপিন ঘোষকে নিশীথ পাত্রের এমন কি দরকার?

তাঁর তো কাউকে দরকার হয় না কখনও। বিপিন ঘোষের মত মানুষকে অন্তত কখনও নয়। ভেবে ভেবে রহস্যটার কোন কূল-কিনারা পায় না বিপিন।

তার নিজের কিছু কথা ছিল বটে বলবার। কিন্তু এমন কিছু জরুরী নয় যে আজ না বললেই চলে না। অন্যদিন এমন এসে বাড়িতে নিশীথ পাত্রকে না পেলে সে ফিরেই যেত।

আজ কিন্তু ঔৎসুক্যের চেয়ে উদ্বেগই নিয়ে বসে থাকতে হয়।

নিশীথ পাত্র কি আজ এমন কিছু বলবেন যা আগে কখনও বলেননি?

ইচ্ছে করলে অনেক আগেই অনেক শক্ত কথা তিনি বলতে পারতেন। কিন্তু তা যখন বলেননি তাহলে এমন কি নতুন কথা তার সম্বন্ধে শুনেছেন যার জন্যে তাকে বসিয়ে রাখার এই অপ্রত্যাশিত নির্দেশ?

এতদিন বাদে নিশীথ পাত্র যদি সত্যি সত্যিই প্রকাশ্যভাবে তার

ওপর বিরূপ হন, তাহলে তার কিছু ক্ষতি ও অসুবিধে হতে পারে সন্দেহ নেই।

কিন্তু তাও না মেনে নিয়ে উপায় কি! নিজেকে সংশোধন করবার কোন বাসনা তার নেই। নিজের সঙ্কল্প থেকেও টলবার।

নিশীথ পাত্র ফিরে আসবার পরও রহস্যটা কিন্তু পরিষ্কার হয় না।

তিনি যাদের সঙ্গে ফেরেন তাদের একজন তাঁর পরিচিত। হাইকোর্টের একজন অ্যাটর্নি। নিশীথ পাত্রের এই বাড়িতেই আগেও দেখেছে। রাজনীতির সঙ্গে একটু যোগাযোগ রাখেন।

অ্যাটর্নি ভদ্রলোকই নিশীথবাবুকে নিজের গাড়িতে এনে বাড়ির ভেতর পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে যান। যাবার সময় একটা মোটা ফোলিও ব্যাগ নিশীথবাবুর কাছে রেখে যান।

ব্যাপারটা অত্যন্ত গোলমেলে ঠেকে বিপিনের। তাকে অপেক্ষা করিয়ে রাখার সঙ্গে এ সবের কোন সম্বন্ধ না থাকবারই কথা। তবু অস্বস্তি একটু হয় বই কি!

সঙ্গীরা চলে যাবার পর নিশীথবাবু কেমন একটু অদ্ভুতভাবে তার দিকে তাকাল বলে বিপিনের মনে হয়। হয়ত তার মনেরই ভুল।

বিপিনবাবু দাওয়ার ওপর তার কাছেই তক্তপোষে বসেছেন।

নিজের অস্বস্তিটা ঢাকবার জন্যেই বিপিন বলে,—শ্রীহরির কাছে শুনলাম আপনি আমায় অপেক্ষা করতে বলেছেন।

হ্যাঁ বলেছিলাম, এলে বসিয়ে রাখিস। তা এসেছ কতক্ষণ?

ঘণ্টা দেড়েক হবে।—বলে বিপিন একটু উৎসুকভাবেই নিশীথ পাত্রের দিকে তাকায়।

কিন্তু তিনি একবার শুধু হুঁ বলে চুপ করে ফোলিও ব্যাগটার ভেতর থেকে ক'টা টাইপ-করা কাগজ বার করাতেই ব্যস্ত হন।

বিপিন বাধ্য হয়ে নিজের কথাটাই পাড়ে,—আপনাকে একটা কথা ক'দিন ধরেই বলতে চাইছি। আপনি সেদিন সভায় উমাপতির

স্মৃতিরক্ষার জন্যে কিছু করবার দরকার নেই বললেন, কিন্তু আমি একটু মুশকিলে পড়েছি।

কাগজগুলো বার করে তক্তপোষের ওপরই উল্টে রেখে নিশীথ পাত্র বলেন,—কি মুশকিল ?

আমি তো এবার অন্তত কিছুদিনের জন্যে বাইরে যাবো, ভাবছি। কোথায় যাবো, কোথায় থাকব কিছু ঠিক নেই। উমাপতির বই-টই থেকে কাগজপত্র-টত্র যা আছে সেগুলোর কি ব্যবস্থা করব? ওঁর নামে একটা লাইব্রেরী গোছের কিছু করলেও সেখানে রেখে দেওয়া যেত।

রাখবার দরকার কি! সব পুড়িয়ে দাও না।

পুড়িয়ে দেব!—বিপিন চমকে ওঠে, নিশীথ পাত্র না জেনে উমাপতির শেষ ইচ্ছারই কি করে প্রতিধ্বনি করলেন ভেবে না পেয়ে।

পুড়িয়ে দিতে চাও না?—নিশীথ পাত্র তার দিকে চেয়ে হাসেন,—ও সবের ভেতর আমাদের মত অনেকের মৃত্যুবাণ আছে বলে তো আমার ধারণা। কিন্তু সেগুলো কি কাজে লাগান যাবে? গেলেও কতই বা ওগুলো থেকে আদায় হতে পারে?

যাই ভেবে থাকুক, নিশীথ পাত্রের মুখে এরকম কথা শোনবার জন্যে বিপিন ঘোষ প্রস্তুত ছিল না। ক্ষণিকের জন্যে অন্তত সে কেমন হকচকিয়ে যায়। তারপর নিজেকে কোনরকমে সামলে বলে,—আপনি যা বলছেন···

তা তোমার মাথাতেই আসেনি। এলেও খুব অন্যায় কিছু নয়। কতকগুলো মুখোশ টান মেরে খুলতে লোভ তো হতেই পারে। তার ওপর যদি উপরি লাভ কিছু থাকে। কিন্তু ঝামেলাও আছে অনেক।

এবার বিপিন ঘোষ কোন কথাই আর বলতে পারে না। গুম হয়ে বসে থাকে।

নিশীথ পাত্রই টাইপ-করা কাগজের তাড়াটা তার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলেন,—শোন, যে-জন্যে তোমায় বসিয়ে রেখেছি। এই

কাগজগুলো নিয়ে যাও। আজ ভালো করে পড়ে বুঝে কাল সকালেই আবার আসবে।

এ কিসের কাগজ? আইন-আদালতের ব্যাপার মনে হচ্ছে?—বিপিন বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করে।

পড়ে দেখলেই বুঝতে পারবে। তবে এখানে নয়। বাসায় গিয়ে ধীরে সুস্থে পড়বে। তুমি তো এখনো উমাপতির সেই বাসাতেই আছ?

হ্যাঁ। এই মাসটা পর্যন্ত আছি। বাড়িওয়ালা নোটিশ দিয়েছে অনেক আগেই, এই মাসের শেষেই ছাড়তে হবে।

একমাসের মধ্যে কত কি হতে পারে কেউ জানে!—বলে নিশীথ পাত্র যেন অকারণে হাসতে থাকেন। সেই হাসির শব্দ কানে নিয়েই বিপিন ঘোষ বেরিয়ে যায়।

উনিশ

এই মাত্র ছেলেটি চলে গেল।

বেশ চমৎকার ছেলে। বুদ্ধিমান সপ্রতিভ অথচ অত্যন্ত ভদ্র। মুখে একটা তীক্ষ্ণ উজ্জ্বলতা আছে। এ যুগে এরকম ছেলে দেখলে আনন্দ হয়।

কি নাম যেন? অসীম রাহা, হ্যাঁ অসীম রাহাই নাম।

প্রথমে বেশ রাগ ও বিরক্তই হয়েছিল তার সঙ্গে দেখা করতে চায় শুনে। স্কুলেই একটা শ্লিপ পাঠিয়েছিল হাতে লিখে,—'আপনার সঙ্গে বিশেষ প্রয়োজনে একটু দেখা করতে চাই।—অসীম রাহা।

শ্লিপটা দেখে জয়া অবাক হয়েছিল, বিরক্তও। কে অসীম রাহা? কোনো অসীম রাহাকে সে চেনে না। তার সঙ্গে বা কি দরকার থাকতে পারে?

তবু রূঢ় হয়ে ফিরিয়ে দিতে পারেনি। কমন রূমে ডাকতে বলেছিল।

চেহারা দেখে অন্তত ভয়টা গেছল! না, কোন প্রকাশকের ক্যানভ্যাসার নয়। বই ধরাবার উমেদারী করতে আসেনি। যারা সে উদ্দেশ্যে আসে যেমন-সাজপোশাকই হোক দেখলেই চেনা যায়।

তার আরজি শুনে কিন্তু যেমন বিস্মিত তেমনি আবার একটু উত্ত্যক্তও হয়েছিল।

দীর্ঘ কোন ভূমিকা না করে ছেলেটি স্বল্প কথায় তার উদ্দেশ্য জানিয়েছিল। উমাপতি ঘোষাল সম্বন্ধে তার কাছে কিছু শুনতে চায়।

কথাটা শুনেই জয়ার মুখ কঠিন হয়ে উঠেছিল আপনা থেকেই। উমাপতি ঘোষালের কথা জানবার এ আগ্রহ কেন? কি অধিকারে?

তাব কাছেই বা আসবার মানে কি? তার সংস্রবের কথা জানতে পারলই বা কি করে?

সেই কথাই জিজ্ঞাসা করেছিল।

উমাপতি ঘোষালের কথা জানতে আমার কাছে আসার মানে কি? আমার খোঁজই বা পেলেন কোথায়?

একটা সূত্র ধরে যেতে যেতে আরেক সূত্রের সন্ধান মেলে।—অসীম বিনীতভাবে হেসে বলেছিল,—সব সূত্রই তো কোথাও না কোথাও জড়ানো। আপনার ঠিকানা যোগাড় করতে অবশ্য বেশ অসুবিধা হয়েছে।

কিন্তু এসব অসুবিধা কেন ঘাড়ে নিচ্ছেন? উমাপতি ঘোষালের কথা জেনে কি হবে?

কিছুই হবে না।—অসীমেব গলায় একটা আন্তরিকতার সুর পেয়েছিল জয়া,—আমার একটা কৌতূহল। আমাদের যখন বোঝবার বয়স হয়েছে, তখন উমাপতি ঘোষালের নাম আমাদের আকাশে প্রায় আগুনের অক্ষরে লেখা। সে নাম কেন কি করে মুছে গেল এমন করে তাই আমি বোঝবার চেষ্টা করছি।

সে বোঝবার চেষ্টায় আমার কাছে কি সাহায্য পাবেন আশা করেন? কি করে কেন সে নাম মুছে গেল সে বহস্যের মীমাংসা কি আমি করে দেব?—জয়ার কণ্ঠস্বরে এখন আর বিরক্তি নেই, বরং একটু সহানুভূতি।

আপনি করে দেবেন না জানি। তবে আপনাদের কাছ থেকে টুকরো জানাগুলো নিয়ে জুড়তে জুড়তে হয়ত উত্তরটা বেরিয়ে যেতে পারে।

কিন্তু আমি কতটুকুই বা আপনাকে বলতে পারব।—বলেছিল জয়া, কিন্তু সেই সঙ্গে পরের দিন ছুটির পর তার বাসায় যেতে বলে ঠিকানাও দিয়েছিল।

সত্যি কতটুকুই বা জয়া বলতে পেরেছে! কতটুকু বলা তার পক্ষে সম্ভব?

উমাপতির সঙ্গে প্রথম পরিচয় হবার কথা বলেছে, বলেছে তার সেই পত্রিকার সঙ্গে জড়িত হওয়ার কথা। উমাপতি তখন কিভাবে কাগজ চালিয়েছে, কেমন করে কখনও ঝড়ের বেগে লিখেছে, আবার কখনও কলম দিয়ে একটা আঁচড় টানতে চায়নি, উমাপতির দৈনন্দিন জীবন তখন কিরকম ছিল, এই সবেরই একটা বিবরণ দিয়ে গেছে জয়া।

অসীম রাহাকে এই বয়সেই অত্যন্ত স্থির ধীর বিচক্ষণ মনে হয়েছে জয়ার। অসীম অযথা কৌতূহল প্রকাশ করেনি, অস্বস্তিকর প্রশ্ন তোলেনি। কিন্তু বাহ্যিক বিবরণের পেছনে যা অব্যক্ত তাও কিছু অনুমান করতে পেরেছে বলে মনে হয়।

ধন্যবাদ দিয়ে বিদায় নেবার সময় সে বলে গেছে শুধু,—উমাপতি ঘোষাল নির্বাচন সংগ্রামে নেমেও কেন শেষ মুহূর্তে হঠাৎ সরে দাঁড়ান এ রহস্যের বোধহয় কখনো মীমাংসা হবে না।

জয়া চুপ করে থেকেছে। আর কিছু সে বলতে চায় না, বলতে পারে না।

সেই দিনের কথা কি কাউকে বলা সম্ভব, আত্মগোপনের জন্যে এই নতুন বাসায় একদিনের চেষ্টায় উঠে আসা সত্ত্বেও যেদিন উমাপতি তার খোঁজ করে এখানে এসেছিল?

ওই সিঁড়ি দিয়ে সোজা উঠে এসে দাঁড়িয়েছিল ওই সামনের দরজাটা আড়াল করে।

জয়া মুখ তুলে চেয়ে কিন্তু চমকে ওঠেনি।

সে যেন জানত, অবচেতন মনের কোন গূঢ় রহস্য-সঙ্কেতে জানত উমাপতির সঙ্গে এমনি করে দেখা একবার হবেই।

খোলা দরজাটা যেন একটা ছবির ফ্রেম।

আর উমাপতির দু'কাঁধের ওপর আসন্ন সন্ধ্যার যে রক্তাভ আকাশের অংশটুকু দেখা গেছে তা যেন উমাপতিরই গহন সত্তা থেকে বিচ্ছুরিত আভা।

উমাপতির মুখটা ভালো করে দেখা যায়নি। শুধু অনুভব করা গেছে তার উপস্থিতির গাঢ়তাটুকু।

অনেকক্ষণ—কতক্ষণ মনে নেই—উমাপতি আঁকা ছবির মতই স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থেকেছিল দরজায়। তারপর ঘরের ভেতর এসে জয়ার খাটটার ওপরই বসেছিল।

জয়া তখন কাজ করার ছোট টেবিলটা থেকে উঠে দাঁড়িয়েছে।

উমাপতিই প্রথম কথা বলেছিল।

বাসাটা তো বেশ খুঁজে বার করেছ!

জয়া তখনও নীরব। জিজ্ঞাসা করতে পারত, কিন্তু তুমি আমায় খুঁজে বার করলে কি করে? কেন?

সে প্রশ্ন যেন অর্থহীন মনে হয়েছে।

উমাপতি আবার বলেছিল,—ভালোই করেছ চলে এসে। এমনি শক্ত হয়েই যেন থাকতে পারো।

এ কথারও উত্তর হয় না। তবু জয়া এই সাক্ষাতের দুঃসহ আলোড়নকে অস্বীকার করবার জন্যে সহজ হবার চেষ্টা করে বলেছিল,—আপনাকে ক্লান্ত মনে হচ্ছে। একটু চা করব?

উমাপতি হেসেছিল। বলেছিল, তাই করো। তোমায় অতিথি সৎকারের পুণ্য থেকে বঞ্চিত করতে চাই না। কিন্তু অতিথিকে শুধু চা দিয়েই বিদায় করবে?

কত উত্তরই এ কথার দেওয়া যেত। বলতে পারত, অতিথির সত্যকার প্রয়োজন কিছুর আছে যদি জানতে পারত তাহলে তা মেটাবার জন্যে নিজেকে একজন যে দেউলে করতেও পারত তা তুমি কেমন করে জানবে! কিন্তু তোমার চাওয়া-পাওয়ার হদিস তুমি নিজেই হয়ত জান না, তা আমি জানব কি করে? তাই তো সেই অনিশ্চয়তার যন্ত্রণা থেকে জর্জর হয়ে সরে আসবার চেষ্টা করেছি।

কি বলেছিল তার বদলে?

বলেছিল,—না, শুধু চা কেন! আর কিছু আনাচ্ছি।

কথাটার স্থূল তুচ্ছতা তার নিজের হৃদয়ের ওপরই যেন কশাঘাত করেছিল।

না, তার দরকার হবে না।—উমাপতি তার দিকে অদ্ভুত দৃষ্টিতে চেয়ে হেসে বলেছিল,—তুমি চা-ই করো শুধু। আমি তোমার বিছানাটায় ততক্ষণ একটু গড়িয়ে নিই।

সত্যি সত্যিই উমাপতি তার সেই বিছানার ওপর শুয়ে পড়েছিল। বালিশটা মাথায় দেবার তর সয়নি। জয়াই বালিশটা এনে মাথার তলায় গুঁজে দিয়েছিল।

জয়া শুধু চা করেনি। বাড়িওয়ালার ঝিকে দিয়ে বাইরে থেকে খাবার আনাতে পারত, কিন্তু তা না আনিয়ে নিজেই তাড়াতাড়ি করে ময়দা মেখে বেলে ক'টা নিমকি ভেজেছিল প্রথমে।

সময় পেয়ে আরো কিছু করতে পেরেছিল।

উমাপতি বালিশে মাথা দিতে না দিতেই ঘুমের মধ্যে ডুবে গেছে, যেন কতদিন কতরাত সে ঘুমোয়নি।

তার এই নিশ্চিন্ত ঘুমটুকুর জন্যেই যেন সে আজ জয়ার এই নিভৃত আত্মগোপনের নীড়টি খুঁজে বার করেছে।

কি অদ্ভুত যে অনুভূতি সেদিন হয়েছিল আজও যেন হৃদয়ের সঙ্গে তা জড়িয়ে আছে বলে জয়ার মনে হয়।

তবু তা আনন্দ না বেদনা, গর্ব না গ্লানি জয়া বোঝাতে পারবে না কাউকে।

বাড়িওয়ালাদের সঙ্গে তখনও মনোমালিন্য হয়নি। গৃহিণী মাঝে মাঝে গল্পগুজব করতে ওপরে আসেন। আজও হয়ত আসতে পারেন, এবং এসে অপরিচিত একজন পুরুষকে জয়ার বিছানায় নিদ্রিত দেখে কি না ভাবতে পারেন জেনেও ভয়ের বদলে একটা কেমন উল্লাসের উত্তেজনাই সে অনুভব করেছিল।

কলঙ্ক দিয়েই তার এই দুর্লভ মুহূর্তটি চিহ্নিত হয়ে থাক।

এই ঘটনাটুকু মিথ্যা কুৎসার উপাদান হয়ে থাকলেও যেন তার কি এক অস্বাভাবিক তৃপ্তি।

কিছুই অবশ্য তেমন হয়নি।

এক সময়ে উমাপতি নিজেই ঘুম ভেঙে উঠে বসেছে। তাবপর অবাক হয়ে বলেছে,—সত্যিই তাহলে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম!

এখনো সন্দেহ হচ্ছে? ঘড়িটার দিকে চেয়ে দেখুন না।

ঘড়িতে তখন প্রায় দশটা বাজে। সেদিকে চেয়ে উমাপতি বলেছে,—তাই তো! তোমার চা নিশ্চয় ঠাণ্ডা হয়ে গেছে।

তা হয়েছে। কিন্তু আর একবার করতে কতক্ষণ। কিন্তু এখন আর চা খাবেন? তার বদলে···

উমাপতি বাধা দিয়ে বলেছে,—না না, খাই যদি চা-ই খাব। কিন্তু তুমি আমায় ডাকোনি কেন জয়া?

অমন অগাধে একটা মানুষ ঘুমোলে তাকে ডাকা যায়!

কিন্তু এখনো আমি যদি নিজে থেকে না উঠতাম, যদি অনেক রাত পর্যন্ত ঘুম আমার না ভাঙত!

জয়া ম্লান মুখে একটু হেসেছে, তারপর বলেছে,—কি হলে কি হত তা নিয়ে ভেবে লাভ কি? আপনি তো সারারাত সত্যি ঘুমিয়ে থাকেননি।

না, তা থাকিনি।—উমাপতি হঠাৎ হেসে উঠেছে,—ঘুমের মধ্যেও কোথায় নিজেকে পাহারা দিচ্ছিলাম বোধহয়।

জয়া আবার চা তৈরী করেছিল। উমাপতিকে আসন পেতে বসিয়ে খাইয়েওছিল; শুধু নিমকি নয়, লুচি তরকারীও সেই সঙ্গে। সময় পেয়েই তৈরী করেছিল এসব।

উমাপতি অত্যন্ত তৃপ্তি করে খেয়েছিল। খেতে খেতে হেসে বলেছিল,—তোমরা কাছে বসে খাওয়ালে ক্ষিদেটা এত বেড়ে যায় কেন বল তো?

পরিহাসের সুরটাই ধরে রাখবার চেষ্টায় জয়া বলেছিল,—ওটা ক্ষিদে বাড়া নয়, বেশী খেয়ে মেয়েদের একটু তোষামোদ। আপনারা জানেন মেয়েরা ওতে গলে যায়।

আর তোমরাও জানো,—উমাপতি হাসতে হাসতে বলেছিল,—পুরুষদের হৃদয়ের খিড়কি এই পেটের ভেতর দিয়ে। তেমন যত্ন করে খাওয়াতে পারলে জব্দ হয় না এমন পুরুষ নেই। তোমাদের শরৎবাবু তাই তো দ্যাখ না দ্যাখ মেয়েদের খাওয়াতে বসিয়ে দিতেন।

রাস্তাটা যদি অত সোজাই হত,—বলে জয়া হঠাৎ জলের গেলাসটা আবাব ভরে আনবার ছুতোয় উঠে গিয়েছিল।

খাওয়া-দাওয়ার পর হাত-মুখ ধুয়ে জয়াব এগিয়ে দেওয়া তোয়ালেতে হাত মুছতে মুছতে উমাপতি বলেছিল,—এবার চলি জয়া।

জয়া মৃদুস্বরে মুখের দিকে না তাকিয়েই বলেছিল,—আচ্ছা।

লঘু পরিহাসের ক্ষীণ রেশটা মুছে গিয়ে ঘরের আবহাওয়াটা আবার ভারী হয়ে গিয়েছে তখন।

মশলার কৌটো থেকে দুটো লবঙ্গ তুলে নিতে নিতে উমাপতিও হঠাৎ গম্ভীর হয়ে বলেছিল,—কি যেন একটা কথা তোমায় বলব বলে এত খোঁজ করে তোমার এখানে এসেছিলাম। তা আর বলা হল না। কথাটা যেন মনের মধ্যে গুলিয়ে গেছে। স্পষ্ট করে তুলতে পারছি না।

ঘুমিয়েই বোধহয় সেটা ঝাপসা হয়ে গেছে।—চেষ্টা করে আনা পরিহাসের সুরটা জয়ার কানেই করুণ শুনিয়েছিল।

জয়ার দিকে নীরবে একবার চেয়ে উমাপতি সিঁড়ির দিকে পা বাড়িয়েছিল নামবার জন্যে।

হঠাৎ জয়া বলেছিল,—দাঁড়ান। আমিও আসছি।

তুমি!—অবাক হয়ে উমাপতি ফিরে দাঁড়িয়েছিল। তারপর

প্রতিবাদ জানিয়ে বলেছিল,—না না, তোমার আসবার দরকার নেই। রাস্তা আমি চিনি।

আপনাকে পথ চেনাতে আমি যাচ্ছি না। সে স্পর্ধা আমার নেই।—জোর করে হেসে জুতাটা পায়ে গলাতে গলাতে জয়া বলেছিল,—সারাদিন ঘরেই আছি। একটু তাই ঘুরে আসব।

বিশ

শুধু একটু ঘুরে আসা আর হয়নি জয়ার। ঘুরেছিল সারারাতই।

সেই তার সারারাত উমাপতির সঙ্গে ঘোরা। শেষ দেখাও উমাপতির সঙ্গে।

সারারাত ঘোরবার উদ্দেশ্য নিয়ে বার হয়নি সত্যিই। উমাপতি চলে যাবার পর ঘরের শূন্যতাটা অনুমান করে যেন অস্থির হয়েই বেরিয়ে পড়েছিল মনটাকে শান্ত করে আনবার জন্যে।

এ অঞ্চল তখন আরো নির্জন ছিল।

তাদের ছোট পাড়াটা ছাড়িয়ে গেলেই বড় রাস্তা। নতুন তৈরী হয়েছে।

ছাড়া ছাড়া দূরে দূরে এক-আধটা বাড়ি অন্ধকারের মধ্যে দ্বীপের মত জেগে আছে।

রাস্তায় লোক চলাচল অত রাত্রে নেই বললেই হয়। মাঝে মাঝে বড় জোর একটা টানা রিকশা ঠুন ঠুন করতে করতে চারদিকের ঘুমন্ত স্তব্ধতাকে একটু তরল করে চলে যাচ্ছে।

অনেক দূর তারা নীরবে পাশাপাশি হেঁটেছিল।

সেই নির্জন রাস্তা যেখানে নতুন বসানো বাজারের কাছে এসে সজাগ হয়ে উঠেছে, সে মোড় ছাড়িয়ে তলায় যার নদীর বদলে অসংখ্য রেলের লাইনের সর্পিল জটিলতা, সেই পোল পেরিয়ে আসল আদি শহর যেখানে শুরু হয়েছে সেখান পর্যন্ত।

সেইখানে পৌঁছে উমাপতি বলেছিল,—এবার তোমাকে ফিরতে হয় জয়া। আমি একটা ট্যাক্সি ঠিক করে দিচ্ছি।

ট্যাক্সি কিন্তু পাওয়া যায়নি।

যা-ও বা পাওয়া গেছে অতদূরে ও অঞ্চলে যেতে রাজী হয়নি।

হেঁটেই ফিরতে হবে মনে হচ্ছে।—জয়া হেসে বলেছিল,—রিকশায় তো আমি চড়ি না জানেন।

হ্যাঁ, তোমার ও কুসংস্কারের কথা জানি। সবাই আমরা কারুর না কারুর মাথায় পা দিয়ে মানুষের পিরামিড তৈরী করে রেখেছি, সেটা চোখে দেখা যায় না বলে শুধু সহ্যই নয়, জ্ঞানে অজ্ঞানে সমর্থনও করি। কিন্তু সে পিরামিড ভাঙতে হাত না তুলে যত বাহাদুরী এই চাক্ষুষ মানুষকে বাহন করতে আপত্তি জানিয়ে।

যতই গালমন্দ দিন, আপনি জানেন আমার আপত্তি যুক্তির নয়, মনের অবুঝ দুর্বলতার। চোখেব যা আড়াল এমন অনেক অন্যায়ই হয়ত মেনে চলছি, কিন্তু চোখে দেখে মানুষকে বাহন করতে পারব না।

তোমাকে তা পারতেও বলছি না।—উমাপতি হেসেছিল,—চলো পৌঁছেই দিয়ে আসি তাহলে। একা তোমার ও-পথে যাওয়া চলবে না।

আবার আপনি অতদূর যাবেন আমার জন্যে?—কথাটা বলেই জয়া চমকে উঠেছিল মনের মধ্যে।

কথাটা থেকে তার অজান্তেই অনভিপ্রেত একটা ব্যথার স্ফুলিঙ্গ কেমন করে যেন ছিটকে বেরিয়েছে।

উমাপতিও একটু চুপ করে থেকে বলেছিল,—একবার না হয় তাই গেলাম।

তবু ফেরা হয়নি। কয়েক পা গিয়ে জয়াই বলেছিল,—পৌঁছেই যখন দেবেন তখন আর একটু পরে গেলে ক্ষতি কি?

ওইটুকুই শুধু বলেছিল। উহ্য কথাটা বলতে পারেনি।

বলতে পারেনি যে বাসায় ফিবে যেতে মন বিদ্রোহ করছে। ইচ্ছে করছে রাত্রের এই শহরের মধ্যে চিরকালের জন্যে হারিয়ে যেতে।

উমাপতি কি বুঝে বলা যায় না আপত্তি করেনি। শুধু বলেছিল, —অনেক রাত হল। তুমি তো খেয়েও আসনি। আমার তো ঘুম খাওয়া সবই হয়েছে।

ঘুম খাওয়া তো রোজই আছে।—হেসেছিল জয়া,—একটা রাত না হয় আলাদাই হোক না।

মনে মনে বলেছিল,—তুমিও বাঁধা পড়বার জন্যে তৈরী হওনি, আমিও বাঁধবার জন্যে। ঘর আমাদের জন্যে নয়, আলো-আঁধারী এই নির্জন শহরের একটা নিরুদ্দেশ রাতই আমাদের সম্বল হয়ে থাক।

উমাপতি আর কিছু বলেনি।

উদ্দেশ্যবিহীনভাবে ঘুরতে ঘুরতে কখন একটা নির্জন পার্কের বেঞ্চিতে গিয়ে বসেছিল। ওপরে নির্মেঘ আকাশে তারাদের উৎসব চলেছে। চারিদিকের শহরের আলোগুলো তারই বিদ্রূপ বলে মনে হচ্ছে।

উমাপতি নগরের ঈষৎ ক্ষুব্ধ স্তব্ধতার সঙ্গেই সুর মিলিয়ে এক সময়ে বলেছিল,—আমি চলে যাচ্ছি জয়া। কোথায় কতদিনের জন্যে জানি না। আজ তোমার বাসা খুঁজতে যাওয়া থেকেই আমার চলা শুরু। কাজের মধ্যে নিজেকে মাতিয়ে তুলতে গিয়ে হার মানলাম, নিজের আন্দামান তৈরী করে নিজেকে নির্বাসিত করেও কিছু হল না। পথে পথে নিরুদ্দেশ হয়ে ঘুরে বেরিয়ে একবার দেখব কি খুঁজছি তা বুঝি কিনা।

পার্কের পাশের রাস্তায় একটা ঊর্ধ্বশ্বাস মোটরকে নগরের গূঢ় যন্ত্রণার আকস্মিক তীব্র শিহরের মত মিলিয়ে যেতে দিয়ে উমাপতি আবার বলেছিল,—আমি নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়িয়েছি বোধহয় জানো। খুশী হয়েছে অনেকে, দুঃখিত কেউ কেউ, অনেকে শুধু অবাক। তুমি কি হয়েছ আমি জানতে চাই না জয়া, কেন আমি সরে দাঁড়ালাম তুমি তাও জানতে চাও না, আমার ধারণা। পরস্পরের

কাছে ওইটুকুই যেন আমাদের অজানা রইল এমনি একটা ভ্রান্তিবিলাস নিয়েই চলে যেতে চাই।

আবার স্তব্ধতা নেমেছে সবকিছুর ওপর।

জয়ার মনে হয়েছে তারা পাশাপাশি আর বসে নেই। স্তব্ধ অন্ধকারের স্রোত ইতিমধ্যেই তাদের দুই সুদূর তীরের দিকে বয়ে নিয়ে চলেছে।

সে স্রোতের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে লাভ নেই।

অনেকক্ষণ বাদে আরেক জয়া যেন উঠে দাঁড়িয়েছে বেঞ্চি থেকে। অপরিচিত কার কণ্ঠে বলেছে,—চলুন, ভোর হতে আর বোধহয় দেরী নেই। এখন গেলে প্রথম ট্রেনটা ধরা যাবে।

জয়া যেখানে বাসা নিয়েছে ট্রেনেও সে অঞ্চলে যাওয়া যায়। স্টেশন থেকে একটু দূর হয় এই যা।

প্রথম ট্রেনটা সেদিন ধরতে পেরেছিল।

তখনও ভালো করে ভোর হয়নি। ট্রেনটা ছাড়বার পর স্টেশনের অস্বাভাবিক আলো থেকে যেন আবছা এক অন্ধকারের জগতেই হারিয়ে যাচ্ছে মনে হয়েছিল।

উমাপতিকে দেখা গেছল অনেক দূর পর্যন্ত।

জনবিরল স্টেশনের আলোকিত প্ল্যাটফর্মে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

একুশ

নীরজা দেবী বিস্মিত হয়ে বারান্দা থেকে ফিরে এলেন নিজের ঘরে। ভঞ্জরায়ের গাড়ি নিচে থেকে ফিরে গেল একা ভঞ্জরায়কে নিয়েই। মলয়া তার সঙ্গে আজ নেই। সে ঘর থেকে বারই হয়নি।

বারান্দাটা ঘুরে নিজের ঘরে যেতে দেখতে পেলেন মলয়ার ঘরে আলো জ্বলছে।

মলয়া আজ তার নিত্যনিয়মিত রাতের টহলে যে বার হয়নি তার জন্যে একটু তৃপ্তির সঙ্গে একটা দুর্ভাবনাও মিশে আছে।

প্রতিদিনের নিয়মের এ ব্যতিক্রমের মানে কি? মলয়ার কিছু হয়নি তো?

তার ঘরে খোঁজ করতে যাওয়ার সাহস নেই। কে জানে কি রূঢ় আঘাত তার কাছে পেতে হবে!

কতদিন হয়ে গেল মা মেয়ে দুজনে এক বাড়িতেই অপরিচিতের মত দিন কাটাচ্ছেন।

কথা যে কখনও হয় না তা নয়। কিন্তু সে নেহাৎ দু'চারটে প্রয়োজনের কথা।

তা না হলে নিরবচ্ছিন্ন নীরবতা দুজনের মাঝখানে।

সে নীরবতা সেই রাত্রের মত কখনও কয়েক মুহূর্তের বিস্ফোরণে ভেঙে যায় মাত্র। তারপর নীরব দূরত্ব আরো যেন বেড়ে যায়।

বাড়ির পরিচারক-পরিচারিকার কাছে খোঁজ নিতে সম্মানে বাঁধে। তবু নিরুপায় হয়ে নীরজা দেবী যতদূর সম্ভব সাবধানী কৌশলে খোঁজ-খবর নেবার চেষ্টা না করে পারেন না, আর পারেন না প্রতিদিন সন্ধ্যায় এই বারান্দায় মলয়ার বেরিয়ে যাওয়াটুকু দেখতে না দাঁড়িয়ে।

দাঁড়িয়ে দেখাটুকুই সার। শুধু একটা নিরুপায় হতাশার অনুভূতি। কিছুই করবার নেই শুধু দীর্ঘশ্বাস চাপবার চেষ্টা ছাড়া।

মন্দের ভালো এইটুকু যে ভঞ্জরায়ই নিত্যকার সঙ্গী।

ছেলেটি এমনিতে মন্দ নয়। ভদ্র সুদর্শন সদ্বংশের।

কিন্তু ওই পর্যন্তই।

জীবন বলতে বোঝে সন্ধ্যা থেকে যত রাত পর্যন্ত সম্ভব একটানা উন্মত্ত উৎসব। সমস্ত দিনটা তারই প্রস্তুতি।

মলয়া কি করে দিনের পর দিন এই জীবন এই সংসর্গ সহ্য করে!

শুধু বুঝি একটা দুরন্ত অসুস্থ জেদ আর তারই মধ্যে জ্ঞাতসারে কিংবা অজ্ঞাতসারে নীরজা দেবীকে আহত করবার একটা বাসনা।

প্রথম প্রথম নীরজা দেবী চেষ্টা করেছেন বাধা দেবার। বোঝাবার চেষ্টা করেছেন সস্নেহে, মলয়া গ্রাহ্যও করেনি। নীরজা দেবী কঠিন হয়ে দেখেছেন। ফল আরো বিপরীত হয়েছে। মলয়ার উদ্দামতা যেন বেড়ে গিয়েছে।

একদিন সরকার মশাইএর হাত দিয়ে মলয়া চিঠি পাঠিয়েছে মার কাছে। মলয়ার কিছু টাকা চাই।

এরকম চিঠি প্রায়ই নীরজা দেবী পান, সরকার মশাইএর মারফত। চিঠির দাবী পূরণে বিলম্ব হয় না।

সেদিনকার দাবীটা একটু অযৌক্তিক। টাকার অঙ্কটা মাত্রা ছাড়া।

নীরজা দেবী একটু ভাবতে সময় নিয়ে তখনকার মত সরকার মশাইকে যেতে বলেছেন।

খানিক বাদে মলয়াই নিজে এসেছে মার ঘরে। ক্রুদ্ধ উত্তেজিত-ভাবে নয়, শান্ত কঠিন পাথরের মূর্তির মত।

এসে শুধু জিজ্ঞাসা করেছে নীরস শুষ্ক কণ্ঠে,—টাকাটা দেওয়ার অসুবিধা আছে তোমার?

নীরজা দেবীই সেদিন উত্তেজিত হয়ে উঠেছেন,—হ্যাঁ আছে।

সবকিছুর একটা সীমা থাকা উচিত। তোমার এই উচ্ছৃঙ্খলতারও। এত টাকা তোমার কি জন্যে দরকার হয়? যে সব অপদার্থের সঙ্গে ঘোরো তারা তো খোলামকুচির মত পৈতৃক পয়সা ওড়ায় শুনেছি!

ঠিকই শুনেছ।—কঠিন চাপা স্বরে মলয়া বলেছে,—শুধু মলি চৌধুরী পদার্থ বা অপদার্থ কারো পৈতৃক পয়সায় উচ্ছৃঙ্খলতা করে না, এইটুকু ভাবতে পারনি! টাকা তোমার কাছে চেয়ে পাঠাই শুধু তোমার সম্মান বাঁচাতে। নইলে কমলদ' এস্টেট থেকে আমার কি প্রাপ্য আমি জানি। এখন থেকে যা দরকার সরকার মশাইকেই মজুদ রাখতে বলব।

মলয়া ঘর থেকে দৃঢ় পদে বেরিয়ে গেছে।

নীরজা দেবী বিমূঢ় বেদনায় স্তব্ধ হয়ে বসে থেকেছেন।

নিজেকেই তিনি অপরাধী করেন মনে মনে। এ শাস্তি তাঁর বুঝি প্রাপ্য ছিল।

এতদিন বাদে নিজের সেদিনের চেহারাটা নিজের কাছে আর যেন আড়াল করে রাখা যায় না।

অথচ সেদিন নিজেকে কি কিছুই পারেননি বুঝতে!

সত্যিই বোধহয় পারেননি।

মনের মধ্যে একটা শ্রদ্ধা বিস্ময় আর উত্তেজনার বেগ ছিল।

উমাপতি ঘোষালের নাম শুনেছেন। উমাপতি ও তার সেই যুগের সঙ্গীদের কিংবদন্তীর রহস্যে জড়ানো নাম।

শুনেছিলেন পরলোকগত রাজশেখর চৌধুরীর কাছেও। স্বামীর প্রথম যৌবনের এই সংস্রবটুকুই তাঁর মনে যেটুকু শ্রদ্ধা জাগিয়েছে।

আরো কোন কোন ধনীর সন্তানের মত সে যুগে রাজশেখর চৌধুরীও নেপথ্য থেকে অগ্নিমন্ত্রের সাধকদের কিছু কিছু সাহায্য তখন করেছিলেন। সংস্পর্শে এসেছিলেন উমাপতি ঘোষালের।

তার জন্যে তেমন কিছু বিপদে পড়তে হয়নি। যেমন করেই

হোক সে গোপন ও নিতান্ত ক্ষীণ সম্পর্ক সেদিনকার রাজশক্তির দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে।

রাজশেখরের মনে কিন্তু এই অধ্যায়টুকু একেবারে হারিয়ে যায়নি। তিনি কখন-সখন অতি ঘনিষ্ঠ অন্তরঙ্গদের কাছে এসব কথা বলেছেন। বলেছেন হয়ত আত্মগরিমার খাতিরেই। কিন্তু নীরজা দেবীর সেদিনের উত্তেজনাপ্রবণ মন তাতে দীপ্ত হয়ে উঠেছে।

তারপর অনেক কিছু ঘটে গেছে জীবনে ও পৃথিবীতে।

রাজশেখর চৌধুরীর মৃত্যু হয়েছে। উমাপতি ঘোষাল দীর্ঘ নির্বাসনের পর ফিরে এসেছে।

একদিন হঠাৎ কি খেয়ালে নীরজা দেবী খোঁজ-খবর নিয়ে উমাপতিকে একবার তাঁদের বাড়ীতে আনবার জন্যে নিজেই তার সেই দূর-দুর্গম আস্তানায় গিয়েছেন। রাজশেখরের নাম শুনে উমাপতি আপত্তি করেননি একবার যেতে।

সেদিন কিন্তু কিছুই এমন হয়নি তাঁর দিক থেকে স্বাভাবিক ও সাধারণ একটু উচ্ছ্বাস প্রকাশ করা ছাড়া।

স্বামীর কাছে সে যুগের কি কি কাহিনী শুনেছেন, উমাপতির কাছে বলতে পেরে নীরজা দেবী ধন্য হয়েছেন। একদিন বধূজীবনেও সবকিছু বিসর্জন দিয়ে মৃত্যুঞ্জয়ীদের সঙ্গে গিয়ে মিলে নিজেকে উৎসর্গ করবার কি উন্মাদনা তাঁর মধ্যে এসেছিল সে কথা না বলে পারেন নি। উমাপতিরই লেখা একটি চিঠি স্বামী ও তাঁর মৃত্যুর পর নীরজা দেবী নিজে কি সযত্নে রক্ষা করে আসছেন তা জানিয়ে সে চিঠিটি এনে দেখিয়েছেন।

নেহাৎ নির্দোষ চিঠি—কিন্তু উমাপতির হাতের লেখা বলে তাঁর কাছে সেটি অমূল্য একথা বলতে ভোলেননি।

উমাপতি অবশ্য প্রথম নীরবে সব শুনে পরে একটু হেসেছিল। বলেছিল,—মনের মধ্যে আমাদের সম্বন্ধে যা এঁকে রেখেছেন তাতে কল্পনার রংটাই প্রধান। একদিন সে রংএর দরকারও ছিল। কিন্তু

আজ তা ধুয়ে-মুছে দেখবার সময় হয়েছে। বোমা যেদিন ফাটবার ফেটেছিল, আজ তার খোলসটাকে মাথায় তুলে রাখার কোন মানে নেই।

নীরজা দেবী উমাপতির এ কথার তেমন কোন মূল্য দেননি। বোঝবার চেষ্টাও করেননি ভালো করে।

মলয়াকে নিয়ে এসেছিলেন, উমাপতির কাছে তার আশীর্বাদ নিতে।

মলয়া সেদিন কিন্তু খুব খুশি-মনে আসেনি ; বরং একটু আপত্তিই জানিয়েছিল। তার আপত্তিতেও যেন উমাপতির কথার প্রতিধ্বনি ছিল।

তোমাদের এই গুরুপুজোর বাতিক আমি বুঝি না। উমাপতি ঘোষালের সেদিনের কথা শুনতে ভালো, কিন্তু তাঁর পায়ের ধুলো নিয়ে আজ কি হাত-পা গজাবে !

শেষ পর্যন্ত মলয়া অবশ্য গেছল, কিন্তু উমাপতির পায়ের ধুলো নেয়নি।

সেদিনের পর উমাপতির সঙ্গে আর কোন যোগাযোগ হয়নি বহুদিন। একটু-আধটু খবর রেখেছেন মাত্র। উমাপতির কাগজ উঠে যাবার খবব। তাঁর নির্বাচনে দাঁড়ানো ও শেষ মুহূর্তে সরে যাওয়ার বিস্ময়।

একদিন যাবো-যাবো করেও আর যাওয়া হয়নি। কেমন একটা সঙ্কোচই হয়েছে।

আগ্রায় সেকেন্দ্রায় অমন করে দেখা যদি না হত আবার !

মেয়েকে নিয়ে উত্তর ভারত ঘুরতে বেরিয়েছিলেন।

হঠাৎ সেকেন্দ্রায় উমাপতিকে দেখে চমকে গিয়েছিলেন। সেকেন্দ্রায় 'গাইডে'র সুললিত উর্দুর বর্ণনা শুনতে শুনতে সবাই যা দেখে বেড়ায় সেসব দেখার সময়ে নয়। সব দেখা সেরে বেরিয়ে আসবার সময়ে একেবারে বাইরের চারটি তোরণের মধ্যে একটির দিকে দৃষ্টি পড়ায় থমকে দাঁড়িয়ে পড়তে হয়েছিল।

তোরণের নিচে দাঁড়িয়ে উমাপতি বাইরের দিকে চেয়ে আছে।

দূব থেকে প্রথম উমাপতি বলে ঠিক চিনতে পারেননি। কিন্তু কেন যে একটা কৌতূহল হয়েছিল আজও বুঝতে পারেন না। বোধ হয় দূব থেকেও উমাপতির চেহারা পোশাক আর দাঁড়িয়ে থাকবার ধরনে এমন কিছু দেখা গেছল যা দুর্বোধভাবে আকর্ষণ করেছিল।

মলয়ার সঙ্গে গাইডকে নিয়ে সেদিকে এগিয়ে গিয়েছিলেন।

গাইড বোঝাবার চেষ্টা করেছিল, ওদিকে ধু ধু শুকনো পাথুরে মাঠ ছাড়া কিছু দেখবার নেই। তার কথায় কান দেননি।

কাছে গিয়ে উমাপতিকে চিনতে পেরেছিলেন।

উমাপতিও ফিরে দাঁড়িয়েছিল পদশব্দ পেয়ে।

নীরজা দেবীর আগে মলয়াই জিজ্ঞাসা করেছিল হেসে,—এখানে দাঁড়িয়ে কি দেখছেন! শুধু তো যাকে বলে আধা মরুপ্রান্তর।

সেই মরুপ্রান্তরই দেখছিলাম।—বলেছিল উমাপতি,—আমার তো মনে হয় এই মরুপ্রান্তরের সঙ্গে না মিলিয়ে দেখলে সেকেন্দ্রার মত সে যুগের কোন স্থাপত্যের সত্যিকার মানে পাওয়া যায় না, গলা আর বুকের যেটুকু খোলা তা বাদ দিয়ে যেমন তোমার লকেটটার। তখন মানুষের সময়ও যেমন ছিল অফুরন্ত, জায়গাও তেমনি ছিল অঢেল। তাই উদার বিস্তৃতিকে তারা যেন স্থাপত্যের নিঃসঙ্গ ঢেউএ সার্থক করত। চারিধারে শহর বসে গেলে এ সেকেন্দ্রার আর কোন মহিমা থাকবে না।

হঠাৎ নিজেই হেসে উঠে উমাপতি বলেছিল,—ওই যা, ভুলেই গেছলাম যে, আপনাদের সঙ্গে গাইড আছে। অনেকদিন বক্তৃতা না দিয়ে জিভটাও বোধ হয় উসখুস করছিল। তা আপনারা কবে এসেছেন?

শেষ প্রশ্নটা নীরজা দেবীকে।

এই কাল বিকেলে।—বলে নীরজা দেবী জিজ্ঞাসা করেছিলেন,—আপনি কোথায় উঠেছেন?

উঠিনি কোথাও।—উমাপতি একটু হেসেছিলেন,—প্ল্যাটফর্মে নেমেছিলাম, আবার ট্রেনেই হয়ত গিয়ে উঠব।

নীরজা দেবী অবশ্য চেহারা পোশাক দেখে আগেই খানিকটা সেইরকম অনুমান করেছিলেন। মাথার লম্বা চুলগুলো প্রায় জটা হবার উপক্রম; একমুখ দাড়ি। কাঁধে একটা বৈরাগীদের মত লম্বা ঝোলা। ধুতি-পাঞ্জাবি কিন্তু ওরই মধ্যে অন্তত কাচা পরিষ্কার। পায়ের চপ্পলটা শুধু ছেঁড়া।

নীরজা দেবী হঠাৎ বলেছিলেন,—ট্রেনে উঠবেন কেন, আমাদের সঙ্গে চলুন না!

আশ্চর্যের বিষয়, মলয়াও তাতে সায় দিয়ে বলেছিল,—হ্যাঁ হ্যাঁ, চলুন, আপনার কাছে সব নতুন ব্যাখ্যা শুনতে চাই।

উমাপতি নীরবে খানিক তাদের দিকে চেয়ে থেকে বলেছিল,—নতুন কিছু শোনাতে পারি না পারি, আপাতত এ নিমন্ত্রণে না বলতে পারলাম না। দুঃখকষ্ট কিছুদিন ধরে কম করিনি, তাই মনে মনে একটু ভোগের লালসা হয়েছে বুঝতে পারছি।

নীরজা দেবী দিল্লী থেকে ভাড়া করে আনা ঝকঝকে স্টেশন-ওয়াগনে উমাপতিকে তুলে তারপর তাঁদের হোটেলেই নিয়ে গেছলেন। উমাপতির জন্যে আলাদা একটি ঘরের ব্যবস্থা করতে বিশেষ বেগ পেতে হয়নি।

সেই দিন বিকেলেই মলয়া উমাপতির সঙ্গে তাঁকেও অবাক করে দিয়েছিল। কখন ইতিমধ্যেই বেরিয়ে সে ভালো ধুতি আর সিল্কের কাপড় কিনে এনেছে। হোটেলের মারফত দর্জিও ডাকিয়েছে। নীরজা দেবীকে সঙ্গে করে সেইসব নিয়ে সে উমাপতিকে তার ঘরে গিয়ে পাকড়াও করেছিল। বলেছিল,—ভোগের লালসা অপূর্ণ রাখতে নেই। নিন, উঠুন মাপ দিন। কাল সকালের মধ্যেই আপনার পাঞ্জাবি তৈরী হয়ে যাবে বলেছে। ধুতি কিনেই এনেছি। জুতোও এখুনি আমার সঙ্গে বেরিয়ে কিনতে হবে।

উমাপতি কোনো কিছুতেই আপত্তি করেনি। এ যেন তার নতুন রকমের একটা অভিজ্ঞতা।

মলয়ার আবদার অত্যাচার হয়ে উঠলেও সে হাসিমুখে সহ্য করেছে।

মলয়া উমাপতিকে চুল ছাঁটিয়ে দাড়ি-গোঁফ কামাতে পর্যন্ত বাধ্য করেছিল। সব হয়ে যাবার পর বলেছিল,—দেখুন দিকি কি জঙ্গলে নিজেকে লুকিয়ে রেখেছিলেন!

উমাপতি হেসে বলেছিল,—লুকিয়ে ছিলাম বলে তবু একটু রহস্য ছিল। প্রকাশ্যে বেরিয়ে যে ধরা পড়ে গেলাম!

মোটেই ধরা পড়েননি! আপনার চেহারাটা যে অসাধারণ তা আপনাকে কোন মেয়ে বলেনি? বলবে আর কোথা থেকে! আন্দামানে গিয়ে তো আর বলে আসতে পারে না!

মলয়ার হাল্কা ছেলেমানুষী চাপল্যে পাছে উমাপতি ভুল বুঝে অসন্তুষ্ট হয় নীরজা দেবীর এই ছিল ভয়। মলয়াকে মৃদু ভর্ৎসনাও করেছেন এই নিয়ে মাঝে মাঝে গোপনে,—কি যা তা বলিস ওঁকে বল তো। উনি কি তোর ঠাট্টা-ইয়ার্কির পাত্র!

মলয়াই তাতে উল্টো ধমক দিয়ে বলেছে,—তুমি থামো তো মা। ওঁর ভেতরেও যে একটা মানুষ আছে আমাদের মত, সেইটে সবাই মিলে তোমরা ভক্তি আর ভয় দিয়ে চাপা দিয়ে রাখতে চাও।

উমাপতি সত্যিই কখনও কিছু মনে করেছে বলে অন্তত বোঝা যায়নি। বরং মলয়ার আবদারে অত্যাচারে তার একটা সহজ স্নেহশীল নতুন চেহারাই ফুটে উঠেছে।

স্টেশন-ওয়াগনে তারা উত্তর ভারতের অনেক জায়গাই ঘুরেছে প্রায় এক মাস ধরে।

এক মাস ধরে উমাপতির অবিরাম সঙ্গ পেয়ে নীবজা দেবী নিজের মধ্যে কি একটা আশ্চর্য রূপান্তর লক্ষ্য করেছেন। জীবনে যেন একটা নতুন তপস্যার আকুলতা এসেছে। একটা কঠিন কিছু, দুঃসাধ্য কিছু করবার অস্থিরতা।

ধর্মেকর্মে তেমন বিশ্বাস থাকলে, কি, উমাপতির কাছে সমর্থন পাবেন জানলে হয়ত ব্রত-উপবাস আর কঠিন কৃচ্ছ্রসাধনায় মন দিতেন।

উমাপতির সাহচর্য পেয়ে মনের ও-ধরনের রূপান্তর হওয়া বাইরের দিক দিয়ে বিচার করলে একটু বিস্ময়কর।

উমাপতি গুরুর আসনে নিজেকে একদিনের জন্যেও বসায়নি। আদেশ-উপদেশ যাকে বলে তা কিছুই দেয়নি।

বরং সে যেন নিজেকে ভ্রাম্যমাণ জীবনের একটা অনায়াস বিলাসের মধ্যে ভাসিয়ে রাখতে চেয়েছে বলেই মনে হয়েছে। মলয়ার সমস্ত খেয়ালখুশিতে সে সায় দেয়নি শুধু, উৎসাহও দেখিয়েছে, কখনও কখনও।

বিনা প্রতিবাদে বিনা দ্বিধায় সে তাদের আদর-পরিচর্যা সবই গ্রহণ করেছে, অনায়াসে তাদের দৈনন্দিন ধারার সঙ্গে নিজেকে মিশিয়ে দিয়েছে এমনভাবে যেন এই নিশ্চিন্ত প্রাচুর্যেই সে চিরদিন অভ্যস্ত, এই ছন্দে জীবন কাটাতে যেন সে প্রস্তুত।

তবু বাইরের এ সহজ উপভোগের স্রোতে গা-ভাসানো উমাপতির আড়ালে আর একটি দুর্জ্ঞেয় গভীর মানুষকে নীরজা দেবী মাঝে মাঝে চকিতে যেন আবিষ্কার করেছেন। হয়ত ভোরবেলায় উঠে দেখা কোন শৈল-নিবাসের নাম-করা হোটেলের বারান্দায় নিস্তব্ধ পর্বতশ্রেণীর দিকে নিবদ্ধ দৃষ্টি, ততোধিক সমাহিত একটি নিঃসঙ্গ আবছা মূর্তিতে, কখনও ট্রেনের সর্বোচ্চ শ্রেণীর কামরায় জানলার ধারে বসে কথা বলতে বলতে অকস্মাৎ সুদূরে হারিয়ে-যাওয়া একটি দৃষ্টিতে, কখনও মলয়ার সঙ্গে ছেলেমানুষী লঘু হাস্য-পরিহাসে মেতে থাকা উপস্থিতির মধ্যেই।

উমাপতির সেই অগোচর সত্তার বিদ্যুৎ-স্পর্শই নিজের মধ্যে কেমন করে পেয়েছেন বলে নীরজা দেবীর মনে হয়েছে।

গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যাকে বলা যায় তেমন কিছুতে সেই ভ্রাম্যমাণ দিনগুলিতে উমাপতির কেমন একটা যেন বিরাগই ছিল। সেরকম

প্রসঙ্গ আপনা থেকে এসে পড়লেও সে ইচ্ছে করেই এড়িয়ে যেত বলে মনে হয়।

হৃষীকেশের কাছেই বোধহয় কোথায় একটি চমৎকার আশ্রম সবাই মিলে দেখতে যাওয়া হয়েছিল একদিন। ফেরার পথে নীরজা দেবী মুগ্ধ কণ্ঠে বলেছিলেন,—সত্যিই যেন স্বর্গ মনে হল।

সেই দিন শুধু যেন হঠাৎ একটু উত্ত্যক্ত হয়ে উমাপতি বলেছিল,—স্বর্গ স্বর্গ! সবাই শুধু স্বর্গ গড়তে চায়। হয় নরক, নয় স্বর্গ, তাছাড়া যেন মর্ত্য বলে কিছু নেই। পারে তো গড়ুক দেখি এমন আশ্রম যা মর্ত্য কাকে বলে তার হদিস দেবে। সেখানে ব্যভিচারেরও প্রশ্রয় নেই, আবার গেরুয়া পরে সব ত্যাগ করে শুধু পরমার্থ চিন্তাই সার করতে হয় না।

উমাপতি নিজের উত্তেজনায় নিজেই যেন বিস্মিত হয়ে চুপ করে গিয়েছিল। হেসে যেন ব্যাপারটাকে হাল্কা করবার জন্যেই বলেছিল,—আশ্রমের ঘি দুধগুলো খাঁটি কিন্তু। সাধুসন্তদের ঐহিক চেহারাতেই তার প্রমাণ পাওয়া গেল।

নীরজা দেবী সেদিন কিছু বলেননি আর, কোন প্রশ্ন তোলেননি, কিন্তু তাঁর মনে একটি বীজ সেইদিনই নিঃশব্দে অঙ্কুর মেলেছিল তিনি জানেন।

সেই বীজ থেকেই দেশে ফিরে গিয়ে উমাপতিকে কেন্দ্র করে সেই বিচিত্র দুঃসাহসিক উদ্যোগ।

উমাপতি প্রথমে কিছুতেই রাজী হয়নি এ প্রচেষ্টার মধ্যে থাকতে। কতবার হেসে বলেছে,—ও আমার একটা আবছা ধোঁয়াটে কল্পনা, নিজের কাছেই স্পষ্ট নয়। হঠাৎ একমুহূর্তের খেয়ালে কি বলতে কি বলেছিলাম। ও পাগলামি যদি করতে চান করুন, আমাকে জড়াতে চাইবেন না। আমার স্পর্শ থাকলে ও পরিকল্পনার ব্যর্থতা অবধারিত। আমি ছুঁলে সাজানো বাগান শুকিয়ে যাবে এই আমার নিয়তি।

নীরজা দেবী কিন্তু নাছোড়বান্দা। জানিয়েছিলেন,—এই নিয়তি জেনেই আমাদের যাত্রা শুরু। এ তো আমরা ব্যবসা করতে কি কারখানা বসাতে যাচ্ছি না যে লাভ-লোকসান সফলতা বিফলতা কষে দেখে নামব। অসাধ্য সাধনের একটা নিষ্ফল চেষ্টাই হোক না এটা, ঠিক কি করতে চাই তাও না বুঝে এগিয়ে যাওয়ার বাতুলতা। আমাদের আশা ভাবনা স্বপ্নই আমাদের পথ নিত্য নতুন করে তৈরী করুক। আপনি যেমন ইচ্ছে আলগোছেই থাকবেন, কিন্তু আপনার খেয়ালকে আশ্রয় করেই যা কিছু গড়ে উঠবে, সে খেয়াল যেমনই হোক। নিজেকে একবার মাত্র নিঃশেষে উৎসর্গ করবার এ সুযোগ থেকে আমায় বঞ্চিত করবেন না।

ভাষা একটু ভিন্ন হতে পারে, কিন্তু এই ধরনের আবেদনই জানিয়েছিলেন। চিঠিতেই মনে আছে।

উমাপতি তখন তার 'আন্দামান' ছেড়ে এসে শহরের একপ্রান্তে বাগানঘেরা একটি ছোট বাড়িতে থাকে। বিপিন ঘোষ তার কিছু কাল আগে থেকেই উমাপতির কাছে এসে জুটেছে একেবারে অচ্ছেদ্যভাবে।

বিপিন ঘোষকে গোড়া থেকেই নীরজা দেবীর ভালো লাগেনি, তার বিদ্যাবুদ্ধির খ্যাতি নম্রতা অমায়িকতা সত্ত্বেও। বিপিন ঘোষই কিন্তু প্রথম দিকে তাঁর প্রধান সহায় হয়েছিল। উমাপতির কল্পনাকে বাস্তবের হিসাব-নিকাশের মধ্যে রূপ দেবার কি এক দুর্লভ ক্ষমতা যেন তার আয়ত্ত।

উমাপতির প্রকৃতির মধ্যে দুটো বিস্ময়কর বিরোধী ঢেউ ছিল। নির্লিপ্ততার অবসাদ এক মুহূর্তে উত্তেজনার তরঙ্গে উদ্বেল হয়ে উঠত।

তাই হয়েছিল এই ব্যাপারে। ঔদাসীন্য নিরাসক্তি দূরে ফেলে দিয়ে হঠাৎ একদিন উমাপতি প্রায় মেতে উঠেছিল বলা যায়।

কৃতিত্বটা বিপিন ঘোষেরই অনেকখানি। এক হিসেবে দিনের পর দিন সে-ই কানের কাছে মন্ত্র দিয়েছে, উমাপতির নিজের মন্ত্রই।

স্পষ্ট কোন পরিকল্পনা তখনও হয়নি। কিন্তু উমাপতি ঘোষালকেই সামনে রেখে শহর থেকে কিছু দূরে ছোটখাট গ্রাম বসাবার মত বেশ কিছুটা জমি নেওয়া হয়েছিল। নীরজা দেবীর টাকাতেই প্রধানত। তখনও কলকাতার আশেপাশের জমি এমন দুর্লভ দুর্মূল্য হয়ে ওঠেনি। সেখানে উপনিবেশ বসান হবে, বাছাই করা মানুষের উপনিবেশ, যাদের প্রতিবেশিত্ব এক নতুন আদর্শের ওপর প্রতিষ্ঠিত, যারা মোক্ষের স্বর্গ চায় না, যারা মর্ত্যের মানুষ হয়ে ব্যক্তিগত ও সামাজিক সম্পর্কের এক গভীর ধ্রুব ভিত্তি সন্ধান করে।

নীরজা দেবী নিজে পরিকল্পনাটা এইরকম বুঝেছিলেন, উমাপতির ব্যাখ্যা এটা নয়।

উমাপতি কোনদিন বিশদভাবে ব্যাখ্যা কিছু করেনি, শুধু মাঝে মাঝে তার মনের ভাবনার ইঙ্গিত তার কথায় কিছুটা প্রকাশ পেয়েছে।

উমাপতি বলেছে,—পৃথিবীতে অনেক অসাম্য,—অর্থের, ক্ষমতার, সুযোগের। সেসব অসাম্য দূর করলেই কি সব সমস্যা মিটে যায়! অসাম্য দূর করবার পরীক্ষা অনেক হয়েছে ও হবে, কিন্তু তার সঙ্গে সব সাম্য যা না হলে বৃথা হয়ে যায়, জীবনের পূর্ণতার সেই আদর্শ খুঁজে যেতে হবে। এ খোঁজার অবশ্য শেষ নেই। এক পূর্ণতার ধারণা আরেক মহত্তর পূর্ণতায় পৌঁছবার ধাপ মাত্র। তবু এই খোঁজাই সব।

কখনও বলেছে,—অসাধুতা অসত্য শঠতার বিরুদ্ধে সমস্ত নিখুঁত আইনের চেয়ে একটা সৎ মানুষের দাম অনেক বেশী। একটা গ্রামের চেহারা বদলাতে পারলে হয়ত সত্যিই পৃথিবী বদলে দেওয়া যায়।

বলেছে,—মানুষকে দেবতা করতে চাইলে দানবকেও স্বীকার করতে হয়। তার বদলে মানুষ মানুষ হোক—তার ক্ষুধায় বেদনায় গ্লানিতে স্বপ্নে দুরাশায়। স্বপ্ন আর দুরাশাই তাকে সমস্ত গ্লানি থেকে উদ্ধার করবে। এমন একটা মর্ত্য-কোণ যদি গড়া যায়, যেখানে

মাটির কঠিন দাবি মেটাতে আকাশের স্বপ্ন আড়াল হয়ে যায় না! লোকে কলমের চারা এনে বাগানে পোঁতে, তার বদলে মানুষের বীজ পুঁতে দেখা যাক্ না ছোট্ট একটা উপনিবেশে!

উমাপতির নিজের বাগানঘেরা ছোট বাড়িটায় নীরজা দেবীকে প্রায় নিত্যই তখন দেখা গেছে। নীরজা দেবী আর মলয়াকে। সব সময়ে একসঙ্গেই নয়।

বাইরে থেকে ঘুরে আসবার পর মলয়াও তখন কেমন বদলাতে শুরু করেছে। সে পরিবর্তন কিন্তু নীরজা দেবী তেমন লক্ষ্য করেননি প্রথম। লক্ষ্য করবার সময়ই কোথা ছিল তাঁর!

শুধু তার সেই চাপল্য কেটে গিয়ে উমাপতির সঙ্গে ব্যবহারে ছেলেমানুষী লঘু খামখেয়ালীর বদলে একটা কেমন সংযম ও গাম্ভীর্য আসছে, এইটুকুই নীরজা দেবীর চোখে পড়েছিল। তাতে তিনি মনে মনে খুশীই হয়েছিলেন।

মলয়ার অবশ্য এইসব পরিকল্পনায় কোন উৎসাহ ছিল না।

উমাপতির সামনেই সে স্পষ্ট বলেছে কতবার,—এরা সবাই মিলে আপনাকে কি বানিয়ে ছাড়ছে আপনি বুঝতে পারছেন! মানুষকে আপনি দেবতা করতে চান না, আর এরা আপনাকেই দেবতা করে তুলছে। আপনি মর্ত্যের স্বপ্ন দেখছেন, আর এরা নিজের নিজের স্বর্গ নিয়েই মত্ত। আমার মা-ই অবশ্য প্রধান পাণ্ডা। এখনো কিন্তু বলছি, সাবধান হন।

সকলে অবশ্য তার কথায় হেসেছে।

কখনও আবার বলেছে,—আপনি মর্ত্যের মানুষ চান। নিজে একটু মর্ত্যে নেমে আসুন দেখি। স্বর্গেও নয়, মর্ত্যেও নয়, ত্রিশঙ্কু হয়ে যেখানে আছেন, সেখান থেকে যদি আপনাকে নামাতে পারতাম!

উমাপতি সকৌতুকে তার দিকে চেয়ে হেসেছে। বলেছে,—আমি যে ত্রিশঙ্কু তা তাহলে ধরে ফেলেছ! আমার নিজেরও তাই কেমন সন্দেহ হয়।

নির্দিষ্ট ছক বেঁধে না হোক, কিছু কিছু কাজ তখন শুরু হয়ে গেছে। অগ্রসর হতে হতে অদলবদল হতে পারে এমন কাজ। জায়গাটা মোটামুটি পরিষ্কার করা হয়েছে, মাঝামাঝি একটা মজা ঝিল কাটা চলছে বড় দীঘি করবার জন্যে। রাস্তাঘাট কোথায় কি রকম হবে তার দাগ কাটাকাটি চলছে। কিছু কিছু নানা দেশের গাছের চারা কোথাও কোথাও বসানও হয়েছে বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্র্যের দিকে লক্ষ্য রেখে।

আসল পরিকল্পনা অবশ্য তখনও সম্পূর্ণ দানা বাঁধেনি। নীরজা দেবী সেটাকে অস্পষ্টই খানিকটা থাকতে দিয়েছেন উমাপতির মনের গতি বুঝে।

কাজ এগুবার সঙ্গে সঙ্গে উমাপতির চিন্তা-ভাবনার মতই সবকিছু ক্রমশ স্পষ্ট রূপ নিক না কেন।

তাঁরা তো ঠিকাদারী কাজ হাসিল করতে নামেননি যে, বাঁধাধরা একটা দায় যত সংক্ষেপে যত সুলভে সম্ভব সেরে ফেলবেন!

শিল্পকমের মত আঁকা মোছা ভাঙা গড়ার ভেতর দিয়ে সমস্ত পরিকল্পনাটা মূর্ত হোক। তাতে কিছু পরিশ্রম কিছু অর্থব্যয় হয়ত বৃথা হয়ে যাবে, কিন্তু যান্ত্রিকের বদলে জীবন্ত সত্তা যে প্রতিষ্ঠানকে দিতে চাইছেন, তার পক্ষে এইটেই তো স্বাভাবিক।

উমাপতি একেবারে সব ভার নিজের হাতে নিয়ে কিছু না করুক, সে-ই সব কিছুর প্রাণকেন্দ্র। উপনিবেশের নামে যে তহবিলটা মজুদ করা হয়েছিল তা নাড়াচাড়া করতে উমাপতির স্বাক্ষরটা সর্বাগ্রে লাগবে এই ব্যবস্থাটুকুতে নীরজা দেবীই জোর করে উমাপতিকে রাজী করিয়েছিলেন।

উমাপতিকে প্রায়ই তখন নীরজা দেবী নিজের গাড়ীতেই উপনিবেশের কাজকর্ম দেখাতে নিয়ে যেতেন। মলয়া কখনও সঙ্গে থাকত, কখনও থাকত না।

থাকলে উল্টোপাল্টা কথাই বলত। বলত,—মার ব্যবসাবুদ্ধি

টনটনে। আপনাকে ভাঙিয়ে চমৎকার একটা ল্যাণ্ড ডেভেলপমেণ্ট স্কীম করিয়ে নিচ্ছেন। পরে ওই সব জমি ভাগা দিয়ে চড়া দামে যাতে বিক্রী করা যায়।

উমাপতি হেসে বলত,—সেও তো মন্দের ভালো। স্বপ্নগুলো একেবারে মাঠে মারা যাবে না।

কোনদিন বা মলয়া প্রশ্ন তুলত,—লাঙল দিয়ে জমি তো তৈরী করছেন, কি বীজ ফেলবেন ওখানে শুনি? মানুষের তো ধান গম যবের মত মার্কামারা বীজ নেই যে যা জেনে রুইবেন তেমনি ফসল দেবে! আমের আঁটি পুঁতে হয়ত আমড়াও ফলবে না।

এ রকম প্রশ্নে কিন্তু উমাপতি হাসত না। বরং কিরকম যেন গম্ভীর অন্যমনস্ক হয়ে যেত। কখনও বা বলত, সমস্যাটা তুমি ঠিকই ধরেছ মলয়া। মানুষের বেলা বীজ না মাটি-জল-হাওয়া, কোনটা বড় তা সত্যিই বলা যায় না। তবু চেষ্টা করতে দোষ কি!

'এক কাজ করলে হয় না?—মলয়া মার দিকে কটাক্ষ করেই বলছে মনে হত—লটারী করে যদি বাসিন্দা বাছাই করেন কেমন হয়! এক টাকার টিকিটে মর্ত্যকোণ! তারপব আপনাদের আর যারা টিকিট কিনবে তাদের বরাত—'

নীরজা দেবী একটু ক্ষুণ্ণ হয়ে বলতেন হয়ত,—এটা হাসি-ঠাট্টার ব্যাপার নয় মলয়া!

হাসি-ঠাট্টা করছি না মা!—মলয়া সত্যিই গম্ভীর হয়ে বলত,—তোমাদের মর্ত্যকোণের জন্যে মানুষ বাছাই নিজেদের বিচারের চেয়ে ভাগ্যের চাকার ওপর ছেড়ে দিলে বেশী ভুল বোধহয় হবে না।

উমাপতি অপ্রত্যাশিতভাবে মলয়ার কথাতেই সায় দিয়ে বলত, ঠিকই বলেছ মলয়া, বিচারের ক'টা মাপই বা আমরা জানি। তাই বাছাই-এর ওপর জোর না দিয়ে মানুষের মনে যাতে পোকা না ধরে সেই সুস্থ পরিবেশটুকু তৈরী করবার চেষ্টা করেই আমরা আশায় দিন গুণব।

নীরজা দেবীর এ ধরনের আলাপ-আলোচনা ভাল লাগত না। মনে হত একটা পবিত্র ব্রতের প্রতিজ্ঞা যেন এখনও অকারণে সংশয়ের দোলায় দোলান হচ্ছে। মলয়ার ছেলেমানুষীতে উমাপতি যেন একটু অতিরিক্ত প্রশ্রয় দিচ্ছেন।

এই প্রশ্রয় দেওয়াটাই সেদিন অত্যন্ত খারাপ লেগেছিল।

নীরজা দেবী গাড়ি নিয়ে উমাপতিকে তুলতে গিয়ে দেখেছিলেন মলয়া তাঁর আগেই সেখানে উপস্থিত।

উমাপতি কোথাও আজ আর যেতে পাবেন না সরাসরিই সে বলে গিয়েছিল মাকে।

মলয়া উমাপতির ছবি আকতে তখনই বসে গেছে সাজ-সরঞ্জাম নিয়ে।

মনের বিরক্তিটা চেপে নীরজা দেবী বলেছিলেন,—কাজের ক্ষতি করে এই সকালেই ছবি না আকলে নয়? ছবি আকা তো আর পালিয়ে যাচ্ছে না। যখন হোক আকতে বসলেই তো হয়!

তা হয় না মা!—মলয়া যেন অবুঝ কাউকে করুণা করে বোঝাবার ধরনে বলেছিল,—সকাল বেলাই মানুষের ভেতরকার চেহারাটা তবু কিছুটা স্বচ্ছ থাকে। তারপর সারাদিনের ধোঁয়া ধুলোর গ্লানিতে তা দাগী হয়ে যায়, ঢাকা পড়ে। সকাল বেলা তাই আকতে বসাটা অন্তত দরকার।

মেয়ের সঙ্গে নীরজা দেবী আর তর্ক করেননি। মেয়েকে চেনেন বলেই বুঝেছেন তর্ক করে এখন কোন লাভ নেই। উমাপতিকেই একটু ক্ষুণ্ণ স্বরে বলেছেন,—আপনিও দরকারী কাজ ফেলে এই ছেলেমানুষীতে রাজী হয়ে গেলেন!

উমাপতি কিছু বলেনি। কিন্তু তার মুখে ঈষৎ কৌতুকের হাসির সঙ্গে একটা কেমন গভীর বিষণ্ণতার আভাসই কি তখন দেখেছিলেন? ঠিক বুঝতে পারেননি তখনও, এখনও পারেন না।

উমাপতির হয়ে মলয়াই তুলির একটা টান শেষ করে সেটা বিচার করতে করতে মার দিকে না চেয়ে বলেছিল,—এ কাজটাও কম দরকারী নয় মা।

নীরজা দেবী আর নিজেকে সংবরণ করতে পারেননি। একটু তিক্ত স্বরেই বলেছিলেন,—দরকারী যদি হয়, তাহলে বড় আঁকিয়ে কাউকে ডাকলেই তো হয়!

না, তা হয় না। মলয়া তাঁর কথাটার কোন মূল্যই দেয়নি,—তারা অনেক ভালো আকবে নিশ্চয়। কিন্তু আমার দেখাটা পাবে কোথায়?

বেশ, তোমাদের ছবি আঁকাই তাহলে চলুক!—বলে নীরজা দেবী একলাই কাজের জায়গায় চলে গিয়েছিলেন বিপিন ঘোষকে নিয়ে।

তারপর নিজেকে অবশ্য সামলে নিয়েছিলেন। মলয়ার এ খেয়ালে বাধা দেবার আর চেষ্টা করেননি।

উমাপতিকে কিছুদিন তারপর বাদ দিয়েই কাজ করতে হয়েছে। শুধু ছবি আঁকার ব্যাপারে নয়, আরেকটা গুরুতর বিষয় নিয়েও উমাপতিকে তখন সময় দিতে হচ্ছে।

দেশের বড় একটি রাজনৈতিক দলের মধ্যে অসন্তোষ বিশৃঙ্খলা তখন অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। দল ছেড়ে না বেরিয়ে তারই ভেতরে থেকে কয়েকজন বিদ্রোহী একটা ছোট গোষ্ঠী তৈরী করবার আয়োজন করছে। ওপরওয়ালাদের অবিচার অনাচার দূর করবার উদ্দেশ্য নিয়ে। তারা উমাপতিকেই সেগোষ্ঠীর নেতৃত্ব দিতে উৎসুক। প্রস্তাবটা বিপিন ঘোষের মারফতই এসেছে। সে-ই এ ব্যাপারে উৎসাহী।

নিজের দিক থেকে কোন আগ্রহ না দেখালেও উমাপতিকে আলাপ-আলোচনায় যোগ দিতে হয়েছে। যারা আসা-যাওয়া করেছে এই ব্যাপারে, তাদের সরাসরি দরজা থেকে ফিরিয়ে দিতেও পারেনি।

এই সময়েই মলয়াকে চিত্রকলার প্রাণকেন্দ্রগুলিতে ঘুরিয়ে আনবার জন্যে ইওরোপে পাঠাবার কথা উমাপতির সঙ্গে আলোচনা করেছিলেন নীরজা দেবী।

উমাপতি মন দিয়ে শুনেছিল, কিন্তু শেষে একটু সন্দেহ প্রকাশ করে বলেছিল,—ও কি এখন যাবে?

কেন, যাবে না কেন?—নীরজা দেবী যেন বিস্মিত হয়েছিলেন,—ও নিজেই তো যেতে চেয়েছিল কিছুদিন আগে। ছবি আঁকার ওপর যখন এত টান তখন একবার ঘুরে আসাই তো উচিত। সেখানকার জীবন্ত স্রোতের একটু ছোঁয়া লাগলেও তো নতুন করে ফুটে উঠতে পারে।

উমাপতিকে নীরব দেখে আবার বলেছিলেন নীরজা দেবী,—আপনার সায় আছে জানলেই যাবে। আপনি একটু বলে দেখুন না।

বেশ, তাই বলব।—উমাপতি রাজী হয়েছিল।

কিন্তু উল্টো ফল হয়েছিল উমাপতির কথায়।

মলয়া হেসে উঠেছিল বটে, কিন্তু তার কথায় কি একটা জ্বালা খুব প্রচ্ছন্ন থাকেনি! বলেছিল,—আপনিও এই ষড়যন্ত্রের মধ্যে আছেন!

ষড়যন্ত্র!—নীরজা দেবী স্তম্ভিত হয়েছিলেন। উমাপতিও বিস্মিত।

হ্যাঁ,—মলয়া হাসতে হাসতেই বলেছিল,—আমায় ধরে বেঁধে একটা মস্ত আঁকিয়ে করে তোলবার ষড়যন্ত্র। আমি আঁকিয়ে হতে চাই কে বললে? আর চাইলেই ইওরোপ যেতে হবে কেন? ওখানে গেলে কি নতুন হাত-পা গজায়!

তুমিই তো যাবার জন্যে অস্থির হয়েছিলে এক সময়ে!—নীরজা দেবী আহত স্বরে বলেছিলেন।

তখন হয়েছিলাম, এখন নই। অস্থিরতা মানেই তাই!—বলে মলয়া হেসেছিল।

নীরজা দেবী সে হাসিতে একটা অস্ফুট বিমূঢ় বেদনা অনুভব করেছিলেন।

কিছুদিন বাদেই নতুন দল যারা গড়তে চেয়েছিল তাদের নেতৃত্ব নিতে উমাপতি অস্বীকার করে।

এ সিদ্ধান্ত নেওয়ার ভেতরেও মলয়ার কিছু হাত ছিল মনে হয়।

একদিন তো বিদ্রোহী গোষ্ঠীর কয়েকজনের সামনে উমাপতিকেই সে বেশ একটু বিব্রত করে তুলেছিল বলে নীরজা দেবীর ধারণা। সাধারণত নীরজা দেবী এসব আলাপ-আলোচনার মধ্যে থাকতেন না। সেদিন উমাপতিকে দিয়ে গোটাকতক দরকারী কাগজপত্র সই করাতে এসে আটকে গেছিলেন।

আলোচনার মধ্যে মলয়া কখন নিঃশব্দে এসে পেছনে দাঁড়িয়েছে লক্ষ্য করেননি।

তার হাসির শব্দে হঠাৎ চমকে উঠেছিলেন আরো অনেকের মত।

নবাগতদের মধ্যে একজন জিজ্ঞাসা করেছিল বিস্মিতভাবে,—হাসছেন কেন মিস চৌধুরী?

হাসছি আপনাদের বোকামি দেখে!—হাসি থামিয়ে তীক্ষ্ণস্বরে মলয়া বলেছিল, —আতসবাজিকে আপনারা মশাল করতে চাইছেন! উমাপতি ঘোষালের মধ্যে বোমার মত ফাটবার, কি হাউই-এর মত আগুনের ফুলকি ছিটিয়ে আকাশকে কয়েক মুহূর্ত চমকে দেবার বারুদ আছে, কিন্তু মশাল হয়ে জ্বলবার মশলা নেই, তাও আপনারা বোঝেন না?

সকলকে অত্যন্ত অস্বস্তিকর অবস্থার মধ্যে ফেলে মলয়া ঘর থেকে তৎক্ষণাৎ বেরিয়ে গিয়েছিল।

একটু হেসে অনেকে সহজ হবার চেষ্টা করেছিলেন তারপরে, কিন্তু আলোচনা আর জমেনি।

মলয়াকে বিপিন ঘোষই তারপর এক সময়ে নীরজা দেবীর সামনে কপট খোশামুদির সুরে বলেছিল,—আপনি তো চমৎকার কথা বলতে

পারেন মলয়া দেবী ! ঠিক যেন বই-এ লেখা সাজানো কথা !

বই-এ লেখা কথার মতই সাজিয়েছি যে ক'দিন ধরে !—তিক্ত বিদ্রূপের সঙ্গে বলেছিল মলয়া,—সকলকে একবার ঝাঁকানি দিয়ে চমকে দেব বলে।

উদ্দেশ্য ?—বিপিন ঘোষের অবাক হওয়ার মধ্যে আর কপটতা ছিল না।

উদ্দেশ্য, আপনারা সবাই মিলে যাকে নিজের নিজের সুবিধে মত ভাঙিয়ে নিতে চাইছেন তাকে বাঁচানো। উমাপতি ঘোষাল যে গদ্‌গদ উচ্ছ্বাসে-গর্বে শোনাবার মত ফাঁপানো একটা কিংবদন্তী, কি ঝাণ্ডায় ঝোলাবার মত একটা বঙচঙে নাম নয়, আরো কিছু, সে-কথা তাকেও স্মরণ করিয়ে দেওয়া।

উমাপতি কি স্মরণ করেছিল বলা যায় না, কিন্তু নতুন দলের পাণ্ডাদের তার অসম্মতি জানিয়ে দিয়েছিল।

নীরজা দেবী সেই সময় থেকেই বোধহয় দুর্বোধ একটা অস্থিরতা অনুভব করেছিলেন মনের মধ্যে। কেমন যেন অপরাধী মনে হয়েছিল নিজেকে। নিজেকে বুঝিয়ে ছিলেন, একমাত্র মেয়ের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে যথেষ্ট মনোযোগ দিচ্ছেন না বলেই এই গ্লানি।

গড়ভূবগুনার মেজ কুমারের সঙ্গে মলয়ার বিয়ের প্রস্তাবটা তখনই এসেছিল।

নীরজা দেবীর মনে হয়েছিল এর চেয়ে ভালো সমাধান বুঝি আর হতে পারে না।

বড় বনেদী বংশ, কিন্তু পড়তির বদলে বরং উঠ্‌তি। জমিদারীর সঞ্চিত সম্পদ শিল্পে বাণিজ্যে খাটিয়ে বহুগুণ বাড়িয়ে তুলেছে ও তুলছে। সেকেলে গোঁড়াও নয়। শিক্ষায় দীক্ষায়, চালচলনে তাঁদের মতই আধুনিক।

মেজ কুমার কিছুদিন আগে বিদেশের শিক্ষা শেষ করে ফিরেছে, দেখতে শুনতেও ভাল। রাজযোটক আর কাকে বলে ?

নীরজা দেবীর নিজের মনে কোন দ্বিধা সংশয় ছিল না, শুধু উমাপতিকে একবার জানাতে গিয়েছিলেন তাঁকে খুশী করবার জন্যেই।

উমাপতির কথায় একেবারে বিমূঢ় হয়ে গিয়েছিলেন।

পাত্রপক্ষকে কথা দিয়েছেন ?—একটু যেন সন্ত্রস্ত হয়েই জিজ্ঞাসা করেছিল উমাপতি।

একরকম কথা দেওয়াই ধরতে পারেন।—নীরজা দেবী এ প্রশ্নের মানেটা বুঝতে পারেননি।

ভালো করেননি।—বলে উমাপতি গম্ভীর হয়ে গিয়েছিল।

কেন ?—নিজের অজ্ঞাতেই নীরজা দেবীর গলার স্বর তীক্ষ্ণ হয়ে উঠেছিল!

মলয়া তো এ বিয়ে করবে না!—উমাপতির স্বর সত্যিই ব্যথিত।

করবে না! করবে কি না করবে, আপনি আগে থাকতে কি করে জানলেন ? এখনো তাকে কিছু জানাইওনি পর্যন্ত।

তাহলে আর জানাবেন না।

এসব আপনি কি বলছেন!—নীরজা দেবী গলার স্বর নামিয়ে রাখতে পারেননি,—মলয়ার বিয়েতে আপনি খুশী ন'ন! আপনি চান না সুপাত্রে তার বিয়ে হোক ?

আমার চাওয়া না চাওয়ায় কিছু আসে যায় না। বিষণ্ণ কৌতুকের সঙ্গে বলেছিল উমাপতি,—মলয়া এখন বিয়ে করতে রাজী হবে না এইটুকু আমি জানি। তাকে কিছু তাই না বলাই ভালো।

আপনার কথা আমি মানতে পারলাম না। মাপ করবেন। এ বিয়ে আমি দেব-ই।—বলে নীরজা দেবী উত্তেজিতভাবে উঠে দাঁড়িয়েছিলেন যাবার জন্যে।

উমাপতি ক্লান্তভাবে বলেছিল,—আপনি কিন্তু খুব ভুল করছেন। বুঝতে পারছেন না সে একটা আচ্ছন্নতার মধ্যে নিজেকে ডুবিয়ে রেখেছে। জেদ করে তা ভাঙতে গেলে ক্ষতি হবে বড় বেশী।

এ কথার উত্তর পর্যন্ত না দিয়ে নীরজা দেবী ঘর থেকে বেরিয়ে গেছলেন।

উমাপতির কথাই সত্য হয়েছিল।

মলয়া ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিল মার কথা শুনে। গলায় বিষ ঢেলে বলেছিল,—আমার বিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হতে চাও, না? কিন্তু সে নিশ্চিন্ত সুখ তোমায় আমি দেব না, জেনে রাখো। তোমার উমাপতি ঘোষালকে দিয়ে একবার বলিয়ে অবশ্য দেখতে পারো।

উমাপতিকে বলবার জন্যে অনুরোধ করতে নয়, তার বিরুদ্ধে তীব্র অভিযোগ জানাতেই নীরজা দেবী গেছলেন। বলেছিলেন,—আপনিই সবকিছুব মূল। আপনিই প্রশ্রয় দিয়ে ওকে এত বাড়িয়েছেন। আমার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে এ বিয়েতে আপত্তি কবার সাহস ও আপনার কাছেই পেয়েছে বলে আমাব সন্দেহ। আজ থেকে এখানে ওর আসা আমি বন্ধ করলাম।

তাতে কিছু লাভ হবে না।—উমাপতি হেসেছিলেন,—আমি এখানে থাকলে কোন নিষেধ ওকে আটকে রাখতে পারবে না। ও আসবেই। তাই আমি নিজেই না জানিয়ে কোথাও চলে যাব ঠিক করেছি।

না জানিয়ে চলে যাবেন!—রাগ না হতাশা, বিদ্বেষ না আকুলতা, কি যে সমস্ত হৃদয়কে মথিত করে তুলেছিল নীরজা দেবী বুঝতে পারেননি। সমস্ত সংযম হারিয়ে প্রায় চীৎকার করে বলেছিলেন,—আর এখানকাব কাজ?

সে কাজ আর হবে না।—উমাপতির কণ্ঠ শান্ত দৃঢ়।

আর হবে না! মুখের একটা কথা খসিয়ে দিয়েই আপনি নির্বিকার! আপনার ফাঁকিতে ভুলে কী এ পর্যন্ত করেছি জানেন? জানেন কত টাকা এই কাজে ঢেলেছি?—দুঃসহ কী জ্বালায় নীরজা দেবী তাঁর মজ্জাগত শালীনতাও হারিয়ে ফেলেছিলেন।

উমাপতি তবু শান্ত অবিচলিত। বলেছিল,—সবই জানি। কিন্তু

এক কূল বাঁচাতে আর-এক কূলের লোকসান তো মেনে নিতেই হবে।

তার মানে মলয়াকে এখানে আসতে না দিলে আপনি সবকিছু ভাসিয়ে দিয়ে চলেই যাবেন!

উমাপতি অনেকক্ষণ কোন উত্তর দেয়নি। তারপর প্রায় স্নিগ্ধ স্বরে বলেছিল,—আপনি আজ বাড়ি ফিরে যান নীরজা দেবী। পরে আর একদিন আবার আসবেন। তখন যা বলবার বলব।

কি বলবার আছে শোনবার জন্যে পরে কোনদিন নীরজা দেবী আর যাননি।

মলয়াই একদিন তাঁকে এসে জিজ্ঞাসা করেছে,—তুমি উমাপতি ঘোষালের বিরুদ্ধে নালিশ করেছ মা? বলেছ, তোমায় ফাঁকি দিয়ে ভুলিয়ে আজগুবি পরিকল্পনার নামে তিনি অজস্র টাকা নিয়েছেন?

মলয়ার স্বর তুষারশীতল। কোন উত্তাপ তাতে নেই।

নীরজা দেবী কিন্তু চেষ্টা করেও কণ্ঠকে সংযত করতে পারেননি। প্রায় চীৎকার করে বলেছেন,—হ্যাঁ তাই বলেছি। এ সব ভণ্ড শয়তানের মুখোশ খুলে দেওয়াও দরকার!

বেশ করেছ মা! বেশ করেছ! উমাপতি ঘোষালের মত মানুষের এই শাস্তিই দরকার ছিল।

মলয়া ধীরে ধীরে ঘর থেকে চলে গেছে, আর একটি কথাও না বলে।

আদালতে মামলা উঠেছে তারপর। মামলা বেশীদূর গড়ায়নি। উমাপতি নিজে এসে সব অভিযোগ মেনে নিয়েছে, মেনে নিয়েছে সমস্ত দায়িত্ব ঋণ পরিশোধের।

উমাপতির সঙ্গে আর দেখা হয়নি। মলয়াও সেখানে যাবার কোনদিন নাম করেনি।

তার বদলে আরেক উদ্দাম স্রোতে সে যেন অনায়াসে নিজেকে ভাসিয়ে দিয়েছে।

আজ এই প্রথম তার ব্যতিক্রম দেখলেন নীরজা দেবী। সমস্ত মনটা আকুল হয়ে উঠছে মলয়ার ঘরে একবার যাবার জন্যে। শুধু দুটো কথা তার সঙ্গে বলার জন্যে।

কি কথা বলবেন তা জানেন না। মা হয়ে হয়ত সত্যিই মার্জনা চাইবেন মেয়ের কাছে। হয়ত তাও নয়, শুধু তার মাথায় হাত দিয়ে নীরবে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবেন।

মলয়ার ঘরের আলোটা তাঁকে যেন অভয় দিয়ে ডাকছে। তবু সাহস হয় না যেতে।

কি করছে মলয়া তার ঘরে তার দৈনন্দিন নিয়ম ভেঙে ?

নিজেরই লেখা একটি চিঠির দিকে সে চেয়ে আছে। চিঠিটা লিখেছে এই খানিক আগে। লিখেছে অসীম রাহার কাছে। অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত চিঠি। কিন্তু লিখে ঠিক যেন সন্তুষ্ট হতে পারেনি। যা বলতে চেয়েছে ঠিক বলা হল কিনা সন্দেহ হচ্ছে।

লিখেছে,—উমাপতির ছবিটা আপনাকে দিয়েছি। আপনিও দু'দিন দেখে ফেরত দেবেন বলেছেন। ফেরত দিতে আর আপনাকে হবে না। তার বদলে আমার একটা অনুরোধ যদি রাখেন, বাধিত হব। ছবিটা পুড়িয়ে ফেলবেন। নিজে যা আমার উচিত ছিল অথচ পারিনি, তাই আপনাকে দিয়ে করাতে চাইছি। হয়ত তাহলে অতীতের কুহক থেকে আমি মুক্তি পাব। এ চিঠিটাও ছবির সঙ্গে পুড়িয়ে দেবেন।

মলয়া চিঠিটা খামের মধ্যে ভরছে।

হয়ত কাল সকালে সত্যিই পাঠিয়ে দেবে।

বাইশ

বিপিন ঘোষ বিমূঢ় বিহ্বল হয়ে নিশীথ পাত্রের কাছে যায় পরের দিন সকালবেলা।

টাইপ-করা কাগজগুলো নিশীথ পাত্রের সামনে রেখে বলে,—এ আপনি কি করছেন? এ তো নিছক পাগলামি! এত টাকা এমন-ভাবে কেউ নষ্ট করার ব্যবস্থা করে, তাও দলিল দস্তাবেজ করে?

নিশীথ পাত্রের মত যার ভীমরতি ধরেছে সে করে!—নিশীথ পাত্র সকৌতুকে তার দিকে তাকান,—ভালো করে সব পড়ে দেখেছ তো?

দেখেছি। আপনার অনেক টাকা আছে শুনেছি, সন্দেহও করেছি। কিন্তু তা যে প্রায় কুবেরের ভাণ্ডার তা ভাবতেও পারিনি। এই টাকা কোন সৎকাজে দান করা যেত না!

কি সৎকাজ?—নিশীথ পাত্রের চোখে যেন ছেলেমানুষী দুষ্টুমির হাসি,—হাসপাতাল? স্কুল কলেজ? তার জন্যে দান করবার অনেক লোক আছে। কিন্তু আমি যে কাজে দিচ্ছি তার জন্যে কেউ কানাকড়িও দেবে না।

কানাকড়ি দেওয়াও যে জলাঞ্জলি। যেখানে যা নির্বাচনের লড়াই হবে তাতে সৎ ও স্বাধীন লোক যাতে দাঁড়ায় তা দেখবার জন্যে ও তার খরচ জোগাবার জন্যে আপনি ট্রাস্ট করে টাকা রেখে যাচ্ছেন!

কলুর বলদের যদি ক্ষমতা থাকত, তাহলে সে হাড়-চামড়াগুলো কার নামে উইল করে যেত জানিস? ওই কলুর জন্যেই। যাতে তার সুমতি হয়। সারাজীবন রাজনীতির ঘানিই টেনেছি, তাই ও ছাড়া আমার ভাবনা নেই কিছু মরার পরেও।—নিশীথ পাত্রের গলার স্বরটা এবার ভারী মনে হয়।

কিন্তু সৎ ও স্বাধীন লোক খুঁজে বার করবে কে?—বিপিন ঘোষ অবাক হয়ে প্রশ্ন করে।

তুই।—নিশীথ পাত্র বিপিনকে আজ প্রথম অন্তরঙ্গ সম্ভাষণের মর্যাদা দেন।

বিহ্বল বিস্ময়ে বিপিনের মুখ দিয়ে কিছুক্ষণ কোন কথা বার হয় না। তারপর জড়িত স্বরে সে বলবার চেষ্টা করে,—আমি···? আমায়···?

হ্যাঁ, তোকেই ট্রাস্টী করে। সব ভার দিয়ে যাচ্ছি। সই সাবুদ আজই সেরে ফেলতে হবে।

কিন্তু আমায় বিশ্বাস করে···বিপিনের চোখের সামনে সব কিছু দুলছে মনে হয়। কথাটা সে শেষ করতে পারে না।

হ্যাঁ, তোকেই বিশ্বাস করে সব দিয়ে যাচ্ছি। ভাবছিস, এত টাকার লোভ তুই সামলাবি কি করে! সুবিধে পেলেই ফাঁকি দিয়ে ঝুলি ভরবি? পারবি না। সারাজীবন তুই শুধু ফাঁকি দেবার পাঁয়তাড়াই কষলি, কিন্তু স্রেফ নিজেকে ছাড়া কাকে আর কতটুকু ফাঁকি দিতে পেরেছিস! নইলে উমাপতির বানচাল নৌকো তুই আকড়ে বসে থাকতিস না।

কিন্তু আমি কি এ ভার নেবার যোগ্য?—প্রায় অস্ফুটস্বরে জিজ্ঞাসা করে বিপিন।

তোর চেয়ে যোগ্য তো কাউকে খুঁজে পেলাম না। নিজেকে যে চোর বলে চিনেছে, তার চেয়ে হুঁশিয়ার আর কেউ নেই।

নিশীথ পাত্রের সেই ছাদ-ফাটানো হাসি আর থামতে চায় না।

তেইশ

অসীম রাহার ছু' মাসের ছুটি শেষ হয়েছে।

তবু সে অফিসে ফিরে যায়নি।

এ ছু' মাস তার যেন নেশার ভেতর দিয়ে কেটে গেছে।

নেশা গোড়ায় ছিল না। যত দিন গেছে তত নেশা যেন বেড়েছে। একটিমাত্র ধ্যান-জ্ঞান নিয়ে সে কোথায় না গেছে, কি না খুঁজেছে! আগের যুগের পুলিসের লোক থেকে, যার বিন্দুমাত্র সংস্রব ছিল সেই অগ্নিযুগের সঙ্গে সকলের সন্ধান করেছে, পুরনো বই, পত্রিকা, খবরের কাগজ থেকে যেখানে যে দপ্তরের নথীপত্র ফাইল ঘাঁটবার সুযোগ পেয়েছে ঘেঁটেছে।

কাজ তার শেষ হয়নি, তবু আর কিছু করবার বাসনা তার নেই। কাজ অসমাপ্ত রেখেই সে হাত গুটিয়ে নিয়েছে।

রামবাবুর কাছেও বিশদ কোন বিবরণ সে পাঠায়নি। পাঠিয়েছে শুধু একটি চিঠি।

চিঠিটি দীর্ঘ নয়।

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

আপনি যে ভার দিয়েছিলেন তা সম্পন্ন করতে পারলাম না বলে মার্জনা চাইছি। উমাপতি ঘোষাল সম্বন্ধে অনেক তথ্য সংগ্রহ করেছি বটে, কিন্তু তথ্য দিয়ে কোন জীবনেরই সত্য জানা যায় কিনা এ সন্দেহই ক্রমশ বেড়েছে।

একটি তথ্য হয়ত আপনার কাছে মূল্যবান হতে পারে। তাই সেইটিই শুধু জানাচ্ছি। অগ্নিযুগে অভিরাম সেন নামে একজন বড় পুলিস অফিসার বিপ্লবীদের ফাঁদ পেতে ধরতে গিয়ে নিজেই সেই ফাঁদে পড়ে প্রাণ হারান। পুলিসের গুপ্ত ফাঁদের খবর বিপ্লবীদের

কাছে পৌঁছে দিয়েছিল অভিরাম সেনেরই ছোট ভাই। নাম ছিল সম্ভবত বিরাম সেন। অভিরাম সেনের মৃত্যুর পর বিরাম সেন নিরুদ্দেশ হয়ে যায়। বিপ্লবীদের দলেও তাকে আর দেখা যায়নি। এমন প্রমাণও কিছু কিছু পাওয়া যায় যে, অভিরাম সেনের মৃত্যুর বেলা যেমন, উমাপতি ঘোষালের ধরা পড়ার মূলেও তেমনি এই বিরাম সেনের হাত ছিল। দাদার মৃত্যুর জন্যে দায়ী হওয়ার প্রায়-শ্চিত্ত উমাপতি ঘোষালকে ধরিয়ে দিয়েই হয়ত সে করতে চেয়েছিল। বিরাম সেনের ইতিহাস অনুসরণ করতে পারতাম কিন্তু উৎসাহ পাইনি।

আপনি উমাপতির ব্যর্থতার রহস্য জানতে চেয়েছিলেন। তিনি ব্যর্থ কিনা তাই আমার কাছে রহস্য হয়েই রইল।

অফিসে আমার পদত্যাগের পত্র পাঠালাম।

উমাপতিকে খুঁজতে গিয়ে নিজেকে কিছুটা খুঁজে পেয়েছি মনে হচ্ছে।

আর একবার এই গ্রন্থিজটিল রহস্য-নগরীর কবি হবার চেষ্টা করে দেখব। ব্যর্থ হলে আপনার অফিসের দরজা একেবারে বন্ধ থাকবে না এইটুকু আশা।